মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ের উপর দৃঢ় থাকলে মুমিনের অন্তরে খিয়ানত প্রবেশ করে না : (ক) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা ও পথভ্রষ্টতা হ'তে) রক্ষা করে'

(দারেমী হা/২২৭, সনদ ছহীহ)।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ২৩، عدد : ১০، ذو القعدة و ذوالحجة ١٤٤١هـ/ يوليو ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : দোলমা বাহজে মসজিদ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক। এটি ১৮৫৩ সালে ওছমানীয় খেলাফতের ৩১তম সুলতান প্রথম আব্দুল মাজীদের শাসনামলে নির্মিত হয়।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية — ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১-৪২ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুলাই	০৯ যিলক্বদ	১৭ আষাঢ়	বুধবার	৩ : ৪৭	৫ : ১৫	১২ : ০২	৩ : ২১	৬ : ৫০	৮ : ১৭
০৫ ”	১৩ ”	২১ ”	রবিবার	৩ : ৪৯	৫ : ১৬	১২ : ০৩	৩ : ২২	৬ : ৫০	৮ : ১৭
১০ ”	১৮ ”	২৬ ”	শুক্রবার	৩ : ৫২	৫ : ১৮	১২ : ০৪	৩ : ২৪	৬ : ৫০	৮ : ১৬
১৫ ”	২৩ ”	৩১ ”	বুধবার	৩ : ৫৫	৫ : ২০	১২ : ০৪	৩ : ২৫	৬ : ৪৯	৮ : ১৪
২০ ”	২৮ ”	০৫ শ্রাবণ	সোমবার	৩ : ৫৮	৫ : ২২	১২ : ০৫	৩ : ২৭	৬ : ৪৭	৮ : ১২
২৫ ”	০৩ যিলহজ্জ	১০ ”	শনিবার	৪ : ০১	৫ : ২৫	১২ : ০৫	৩ : ২৭	৬ : ৪৫	৮ : ০৯
০১ আগস্ট	১০ যিলহজ্জ	১৭ শ্রাবণ	শনিবার	৪ : ০৫	৫ : ২৮	১২ : ০৫	৩ : ২৯	৬ : ৪২	৮ : ০৪
০৫ ”	১৪ ”	২১ ”	বুধবার	৪ : ০৮	৫ : ২৯	১২ : ০৪	৩ : ২৯	৬ : ৪০	৮ : ০১
১০ ”	১৯ ”	২৬ ”	সোমবার	৪ : ১৭	৫ : ৩২	১২ : ১১	৩ : ৩৮	৬ : ৩৬	৮ : ০৫
১৫ ”	২৪ ”	৩১ ”	শনিবার	৪ : ১৪	৫ : ৩৪	১২ : ০৩	৩ : ২৯	৬ : ৩২	৭ : ৫২
২০ ”	২৯ ”	০৫ ভাদ্র	বৃহস্পতি	৪ : ২৩	৫ : ৩৫	১২ : ০৯	৩ : ৩৭	৬ : ২৮	৭ : ৫৫
২৫ ”	০৫ মুহাররম	১০ ”	মঙ্গলবার	৪ : ১৯	৫ : ৩৭	১২ : ০১	৩ : ২৮	৬ : ২৪	৭ : ৪২

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।
সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ	১৪৪১ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৭ বাং
জুলাই	২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধ :
  - ইমাম গাযালীর রাষ্ট্র দর্শন ০৩
    -ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
  - ছাহাবী ও তাবেঈগণের যুগে মহামারী ও তা থেকে শিক্ষা ০৮
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - পলাশী ট্রাজেডি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু বাস্তবতা ১৩
    -ড. ইফতিখারুল আলম মাসঊদ
  - রবার্ট ক্লাইভ : ইতিহাসের এক ঘৃণ্য খলনায়ক ১৫
    -ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
  - মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব (২য় কিস্তি) ১৮
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - কুরবানীর মাসায়েল ২৪
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- সাময়িক প্রসঙ্গ :
  - করোনা ও মানবতার জয়-পরাজয় ২৮
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - কোথায় মিলবে চিকিৎসা? ৩০
    -মুহাম্মাদ আবু নোমান
- মনীষী চরিত :
  - শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) ৩২
    -ড. নূরুল ইসলাম
- হাদীছের গল্প :
  - উওয়াইস আল-কারানী (রহঃ)-এর মর্যাদা ৩৬
    -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
- অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- চিকিৎসা জগৎ :
  - গ্রীষ্মকালীন ফল-ফলাদির নানাবিধ পুষ্টিগুণ ৩৯
- কবিতা : ৪০
  - কুরবানী
  - করোনা ভাইরাস
  - আতঙ্কের নাম করোনা
  - টাকায় কেনা হজ্জ
- সোনামণিদের পাতা ৪১
- স্বদেশ-বিদেশ ৪৩
- মুসলিম জাহান ৪৬
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৬
- সংগঠন সংবাদ ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মানুষ না মনুষ্যত্ব

বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। যেমন ধর্মের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ধর্ম। একইভাবে আইনের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য আইন। কথাগুলির জওয়াব এককথায় দেওয়া মুশকিল। অথচ এক কথায় জবাব দিতেই হবে। নইলে আপনি সারা জীবন দিশেহারা হয়ে ঘুরবেন।

প্রশ্ন হ'ল, আমরা মানুষ কেন? পশুর সাথে আমাদের ফারাক কি? জৈবিক কামনা-বাসনায় পশুর সাথে কোন ফারাক নেই। অথচ ওদের মা-বোন বাছ-বিচার নেই। মানুষের আছে। পশুদের কোন হালাল-হারাম জ্ঞান নেই। মানুষের আছে। পশুরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। খাও-দাও-ফূর্তি করো, আর অপরের ঘাড় মটকাও- এটাই ওদের সারাক্ষণের কর্মযজ্ঞ। কিন্তু মানুষ নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ায়। সে ত্যাগের মধ্যেই তৃপ্তি পায়। সে দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত লাভে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও হাতে ধরা পানির পাত্র অন্য প্রার্থীকে দেয়। সে মরে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকে তার মনুষ্যত্ব। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাকে স্মরণ করে ও পরকালে রূহের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করে। রেজাল্ট কি দাঁড়াল? মানুষ বড় নয় বরং মনুষ্যত্ব বড়। মনুষ্যত্বই মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। পৃথিবীতে চিরকাল এটাই সত্য। যদিও নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা কেবল বস্তুকেই মুখ্য গণ্য করে। মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা তাদের কাছে গৌণ। আর তাইতো দেখা যায় ছোট ভাই হাবীলের সুনামে ক্ষুব্ধ হয়ে বড় ভাই কাবীল তাকে হত্যা করে। পরে কাবীলও মরেছে। কিন্তু অমর হয়েছে হাবীল। ইব্রাহীম তার পিতা ইরাকের ধর্মগুরু আযরকে নিজ হাতে গড়া মূর্তির অক্ষমতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাতে ক্ষেপে গেলেন পিতা, সমাজ ও দেশের সম্রাট নমরূদ। প্রচলিত ধর্ম অবমাননার দায়ে বিচারে তাকে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার দণ্ড দেওয়া হ'ল। তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হ'লেন। বিজয়ী হ'ল সমাজ। কিন্তু পরাজিত হ'ল মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচার। ফলে ইতিহাসে অমর হ'লেন ইব্রাহীম। ঘৃণার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হ'ল তার সমাজ ও সরকার। একই অপরাধে নিজ জন্মভূমি মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে হিজরত করতে বাধ্য হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আপাতত বিজয়ী হ'ল আবু জাহল, আবু লাহাবরা। কিন্তু পরাজিত হ'ল তাদের মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা। পুত্রহারা মুহাম্মাদকে বলা হ'ল 'লেজকাটা'। অথচ তাঁর রেখে যাওয়া ন্যায় ও সত্যের অনুসারী কোটি কোটি মুমিন এখন বিশ্বের কোণায় কোণায়। তার সাথে মুনাফেকী করল ইবনে উবাই ও তার সাথীরা। তিনি তাদের ক্ষমা করলেন। উভয়ে মারা গেছেন। কিন্তু চিহ্নিত হয়ে আছে ইবনে উবাই। পলাশীতে গাদ্দারী করেছে মীরজাফর ও তার সাথীরা। সিরাজের পর সে বাংলার নবাব হয়েছিল। সিরাজ ও মীরজাফর উভয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। কিন্তু অবাঙ্গালী হয়েও সিরাজুদ্দৌলা সর্বদা বাঙ্গালীর গর্ব। তার নৈতিকতা ও দেশপ্রেম চিরঞ্জীব। পক্ষান্তরে সুবিধাভোগী মীরজাফর-উমিচাঁদরা বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে।

আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি যার যত তীব্র, তার নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব তত উন্নত। তাইতো দেখি গুহায় আটকে পড়া ও সাক্ষাত মৃত্যুমুখে পতিত তিনজন ঈমানদার যুবকের মুক্তিলাভের অবিশ্বাস্য ঘটনা *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯৩৮)*। যা যেকোন মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং অদৃশ্য আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি মাথা নুইয়ে পড়ে। হিজরতের রাতে ছওর গিরিগুহায় শত্রুর সাক্ষাত হামলা থেকে রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকরের অকল্পনীয় মুক্তি যেকোন বিশ্বাসী হৃদয়ে দৃঢ়তা আনয়ন করে। ধনলোভী ক্বারূণ, অত্যাচারী নমরূদ ও ফেরাঊন ইতিহাসের ঘৃণিত জীব। অথচ সর্বস্বহারা ইব্রাহীম ও মূসা মানবজাতির গর্ব ও সর্বমহলে প্রশংসিত ও নন্দিত। মুতার যুদ্ধে ২ লক্ষ ৪০ হাযার খৃষ্টান সেনার বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাযার মুসলিম সেনার অবিস্মরণীয় বিজয় সাধিত হওয়ার পিছনে ছিল একই কারণ। সেদিন তরুণ সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, আমাদের সামনে খোলা রয়েছে মাত্র দু'টি পথ- হয় বিজয়, নয় শাহাদাত। ব্যস এতেই আল্লাহর সরাসরি মদদ নেমে এসেছিল সেদিন। সেনাপতি সহ মাত্র ১২ জন শহীদের বিনিময়ে বিশাল খৃষ্টান বাহিনী অগণিত হতাহতের মধ্য দিয়ে মর্মান্তিক পরাজয় বরণ করে। যার বাস্তব ফল আজকের মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য। এখন সংখ্যা বেড়েছে মুসলমানের। কিন্তু বাড়েনি ঈমান ও তাওয়াক্কুল। আর তাইতো দেখি সর্বত্র ধর্ষক, মদ্যপ, ভদ্রবেশী রিলিফ চোর, ব্যাংক লুটেরা ও চোর-বাটপারদের দৌরাত্ম্য।

করোনার ভয়ে নিজ পিতাকে ঘরে উঠতে দেয়না স্ত্রী ও সন্তানেরা। অবশেষে তাদের চোখের সামনে রাত্রিতে বাড়ীর উঠানে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে ভিজে মৃত্যুর মুখ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত ছেলের লাশ এনেছে অন্য ছেলেরা পরিবারের সদস্যদের শেষবারের মত দেখানো ও কাফন-দাফনের জন্য। কিন্তু দূর থেকে পিতার নির্দেশ ওকে উঠানে এনো না। তখন বাধ্য হয়ে উঠানের বাইরে বৃষ্টি-কাদার মধ্যে গোসল-কাফন সেরে গোরস্থানে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানেও লোকদের বাধা। অবশেষে অজ্ঞাত স্থানে লাশ দাফন করা হ'ল। ঐ ছেলেরা ঐ বাপকে বলে গেল, ছেলেটি আপনার। তাই হাসপাতাল থেকে এনেছিলাম আপনার কাছে। আপনি কাছে এলেন না, এমনকি উঠানেও লাশটা রাখতে দিলেন না নিজের মৃত্যুর ভয়ে। অথচ আমরা তো আপনার ছেলে নই। আমাদের কি মৃত্যুভয় নেই? হ্যাঁ এখানেই পিতা ও পরিবার পরাজিত হয়েছে চিরদিনের মত। পক্ষান্তরে ঐ অচেনা যুবকগুলো নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বকে উড্ডীন করেছে। ওরা অমর হয়েছে ইহকালে ও পরকালে। বৃদ্ধা মাকে সন্তানরা ফেলে গেছে জঙ্গলে। অবশেষে পুলিশ তাকে শিয়াল-কুকুরের হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনে। এ্যাম্বুলেন্সে একজন রোগী হাঁচি দিয়েছে। তাতেই তাকে রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে এ্যাম্বুলেন্স সহ তার আরোহীরা। ঢাকা থেকে রংপুর যাওয়ার পথে একজন যাত্রী হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হয়েছে। গভীর রাতে তার পরিচিত সাথীরা তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেছে। পরে লোকেরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়। একই ফ্ল্যাটে বসবাসকারী কোটিপতি ব্যবসায়ী অন্য রোগে মারা গেলেন। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের কেউই তার পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কেউ হাঁচি দিলেও এখন তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। চিরচেনা বন্ধু আজ অচেনা হয়ে গেছে। তাই আজ মানুষ বাঁচানোর আগে প্রয়োজন মনুষ্যত্বকে বাঁচানো। ক্বিয়ামতের শেষ বিচারে যখন পরস্পরে সাক্ষাত হবে, সেদিন কি জবাব দিবে ঐ নিষ্ঠুর পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরা এবং পরিচিত জনেরা!

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ইমাম গাযালীর রাজনীতি দর্শন

-ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান*

ইমাম গাযালী একজন রক্ষণশীল, যুক্তিবাদী, খিলাফতপন্থী ছিলেন এবং বাস্তবতামুখী জীবনধারা ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর 'মা'আরিজুল কুদস' নামক গ্রন্থে ইমাম গাযালী বলেন, 'পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পারস্পরিক সহানুভূতি না থাকলে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না, সমাজ ব্যবস্থা ও মান-ইয্যত কিছুই টিকে থাকতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সহানুভূতির জন্য যে বিধি বিধান ইসলামে রয়েছে, সেটাকেই বলে শরী'আত'। তাই শরী'আতের উদ্দেশ্য সহযোগিতামূলক ও সামাজিক।

আরো পরিষ্কার কথায়, আল্লামা শিবলী নো'মানী ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও জান-মালের হেফাযতের জন্য দু'টি ব্যবস্থার প্রয়োজন। যথা- পারস্পরিক সাহায্য ও সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমেই মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়। অতএব পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা কল্পে ইমাম গাযযালীর মতে একটি সংবিধান থাকা বাঞ্ছনীয়'।

তবে গাযযালীর মতে, স্পষ্টতঃ যে কোন মানুষ বা ব্যক্তি এরূপ কার্যকর সংবিধান উদ্ভাবন বা রচনা করতে সক্ষম হয় না। বিশেষতঃ গোটা মানব জাতির অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত একটি সংবিধান কেবলমাত্র এমন লোকেই রচনা করতে পারে, যিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে অহীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং যিনি আধ্যাত্মিক জগত থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারঙ্গম ও যাঁর হাতে বিশ্ব শৃংখলার ডোর ন্যস্ত রয়েছে'। অধিকন্তু অহীর ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্মের রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিটি কাজে ন্যায়-নীতির অনুসরণ করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ জ্ঞানের মাত্রা অনুসারে সম্বোধন করে থাকেন। মানুষের কর্মক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনগণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। এরূপ বৈশিষ্ট্য নবী-রাসূলের হয়ে থাকে'।

ইমাম গাযালী নবী-রাসূলকে মানব জাতির সঠিক পথ প্রদর্শক রূপে বিবেচনা করেন। মানুষের জীবন সংগ্রামে সঠিক পথ প্রদর্শনকেই তিনি রাজনীতি তথা ইমামত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি 'মাক্বাছিদুল ফালাসিফা' গ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ বিন্যাস করে বলেন, মানব জীবনের সহায়ক তিনটি প্রায়োগিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি হ'ল রাজনীতি। এ তিনটি বিজ্ঞানকে তিনি এভাবে বিন্যাস করেন, যথা-

'রাজনীতি, অর্থনীতি ও নীতি শাস্ত্র'।

এ তিনটি বিজ্ঞান পরস্পরের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বিজড়িত। অর্থনীতি মানুষের প্রাণীসূলভ চিন্তার সাথে জড়িত। এর সাহায্যে মানুষ মস্তিষ্ক খাটিয়ে বস্তুগত লাভ-ক্ষতি চিন্তা করে। নীতি শাস্ত্র আত্মা, বিবেক ও অন্তরের সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করে এবং এর নৈতিক পরিণতি সম্বন্ধে ভাবে। আর রাজনীতি কোন বস্তু বা পন্থা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার পর তা আহরণ বা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উপায় উদ্ভাবন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। অধিকন্তু রাজনীতির প্রাথমিক গুরুত্বের কারণ, রাজনীতি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে, অর্থনীতি ও নীতি শাস্ত্র অচল হয়ে পড়ে এবং ধর্ম-কর্ম ও সমাজ জীবন বাধাগ্রস্ত হয়।

পক্ষান্তরে ইবনে সীনা, তার 'আকসামুল উলূম' (জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ) গ্রন্থে এ ত্রি-বিজ্ঞানকে 'নীতি শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি বিজ্ঞান' রূপে শ্রেণী ভাগ করেন, যা এ্যরিষ্টটলের বিভক্তির অনুরূপ।

এ ব্যাপারে উভয়ের উপর এ্যরিষ্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এ্যরিষ্টটলের নিছক ইহ জাগতিক ভাবধারাকে সংশোধন করে আল-ফারাবী মানুষের জীবনের আদর্শকে ইহ ও পর জাগতিক বা উভয় জগতের সুখ অর্জনের লক্ষ্য রূপে স্থির করেছিলেন। ইমাম গাযযালী, আল-ফারাবীর সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, 'রাজনীতি ত্রয়ী প্রায়োগিক বিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞান হিসাবে ইহজগতে মানুষের কল্যাণ ও পরজগতে সুখ অর্জন করার লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় এবং তা অর্জন করা সম্ভবপর হয় যখন সরকার শরী'আতের শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাজনীতি শাস্ত্রের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।

তাঁর 'কিতাবুল ইক্বতিছাদ ফিল ই'তিক্বাদ' গ্রন্থে তিনি মুসলিম সমাজের চত্বরে রাজনীতির ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ইসলামের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিকে নেতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেন। এতে তিনি ইমাম মাওয়ার্দীর মতই নেতৃত্ব বা 'ইমামত'কে 'খিলাফত' রূপে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'ইমামত শরী'আতের অঙ্গ, যা সাধারণ ব্যবহারিক বিষয়বস্তু (মুহিম্মাত) থেকে স্বতন্ত্র এবং নিছক পদার্থ-অতীত অধিবিদ্যা সম্মত চিন্তার আওতাভুক্ত নয়। অতএব গ্রীকদের রাজনীতি চিন্তার আলোকে ইমামতের বিষয়াদি পরীক্ষা করার কোন অধিকার দার্শনিকদের নেই।

তিনি বলেন, 'এটি নিছক যুক্তিলব্ধ (জ্ঞানপ্রসূত) নয়; বরং শরী'আতসম্মত চিন্তার ফসল'। তাই তিনি তাঁর অনন্য গ্রন্থ 'মাক্বাছিদুল ফালাসিফা'-তে বলেন, রাজনীতি ত্রয়ী প্রায়োগিক (সমাজ) বিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞান রূপে 'দুনিয়াতে মানুষের কল্যাণ সাধন ও পরকালে সুখ অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত, যা সরকারকে শরী'আতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায়'।

* অধ্যাপক (অবঃ), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ইমাম গাযালীর শ্রেষ্ঠ অবদান এহইয়াউ উলূমিদ্দীন অর্থাৎ ধর্মীয় বিজ্ঞানাদির পুনরুজ্জীবন গ্রন্থে ধর্মকে প্রাণবন্ত ও সমাজকে সচল করতে গিয়ে তিনি সমাজে শৃংখলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার তাকীদে রাজনীতিকে বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়ন করার প্রয়াস পান। রোজেনথালের মতে, এক্ষেত্রে তাঁর ইমামত সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাস্তবতায় পর্যবসিত। তিনি যে সময়ে লিখেছিলেন, তখন বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন অল্প বয়স্ক আল-মুসতাযহির বিল্লাহ। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। এ অবস্থায় তিনি খলীফাকে নিজস্ব খেয়াল খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা না করে আলেমদের সাথে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করার উপদেশ দেন এবং এর ভিত্তিতে রাজনীতির বাস্তবতা স্বীকার করে অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনের খাতিরে খলীফার গুণাবলীর শর্তের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করার উদ্যোগ নেন।

অবশেষে খলীফা মুসতাযহির-এর উপদেশের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর রাজনীতির গ্রন্থ 'কিতাবুল-মুসতাযহিরী'তে তিনি ইমাম মাওয়ার্দী কর্তৃক প্রদত্ত ইমামত বা খিলাফতের শর্তাবলীতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী উপস্থাপন করেন।

প্রথমতঃ তিনি বলেন, এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রশাসনিক দক্ষতা ব্যতিরেকে খিলাফত চলে না, কিন্তু খলীফা যদি নিজ হস্তে প্রশাসন নির্বাহ না করে কোন দক্ষ প্রশাসককে মন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁর হাতে প্রশাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, তবে খলীফার নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার পরিবর্তে মন্ত্রীর দক্ষতাই যথেষ্ট। এরূপ অবস্থায় খলীফার যোগ্যতাসম্পন্ন হ'তে প্রশাসনিক দক্ষতার শর্ত শিথিল করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ অনুরূপভাবে খলীফা যদি জ্ঞানী নাও হন, কিন্তু শরী'আতের হুকুম-আহকাম চালু করার ব্যাপারে যদি আলেমদের পরামর্শক্রমে সমস্ত কর্ম সমাধা করেন, তাতে তাঁর জ্ঞানী হওয়ার শর্ত আলেমদের জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ হবে। অতএব এমতাবস্থায় খলীফার যোগ্যতার ব্যাপারে জ্ঞানী হওয়ার শর্ত শিথিল করা যায়।

তৃতীয়তঃ যখন খলীফার শাসনকার্য, প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন ওয়াযীরের দ্বারা সমাধা হয় এবং শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও বিচারকার্য চালু করার কাজ শরী'আতের জ্ঞানে সুদক্ষ আলেমদের দ্বারা নির্বাহ হয়, সে অবস্থায় খলীফার যোগ্যতার ব্যাপারে প্রাপ্ত বয়সের বাধ্য বাধকতার শর্ত শিথিল করা যায়।

এরূপ শর্ত-শিথিলতার পক্ষ অবলম্বন করার বিশেষ কারণ ছিল ইমাম গাযালীর সময়কালে যখন অল্প বয়স্ক ও দুর্বল মুসতাযহির বাগদাদে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন একদিকে সেলজুক সুলতানেরা মহা পরাক্রমশালী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যারা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন এবং বাগদাদের আব্বাসীয় সুন্নী খিলাফতের সংরক্ষণের জন্য তৎপর ছিলেন। তাঁদের ছত্রছায়ায় মুসতাযহির নাম মাত্র খলীফার আসন অলংকৃত করছিলেন।

আর অন্যদিকে সাত ইমামী[১] শী'আ মতাবলম্বী বাতেনী সম্প্রদায়, যারা বাগদাদের খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী কায়রোর সাত ইমামী শী'আ মতাবলম্বী ফাতেমী খলীফাদের ভক্ত ছিল এবং সে সুবাদে আব্বাসীয় খিলাফতের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল, এ অবস্থায় সেলজুক সুলতান মালিক শাহের অনুরোধে ইমাম গাযালী বাতেনীদের মতবাদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাতেনীদের মতবাদ খণ্ডন করে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁর 'কিতাবুল ইক্বতিছাদ ফিল-ই'তিক্বাদ' এ তিনি খলীফা ও সুলতানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর জোর দেন।

লিউনার্ড বাইনার বলেন, ইমাম গাযযালীর রাজনীতি চিন্তায় সুলতানের ক্ষমতার ভূমিকার অবতারণা করার কারণ হ'ল, যদিও ইমামত প্রতিষ্ঠার জন্য শরী'আত অনুসারে ইজমা-ই যথেষ্ট, তবুও মান্যবর ইমাম অর্থাৎ যাঁকে লোকেরা স্বভাবতই মান্য করে বা মানতে বাধ্য হয় এমন ইমামের অবস্থিতি ছাড়া ইজমা কার্যকর হয় না। অতএব সুলতানের ক্ষমতার দাপট ও সমর্থন প্রয়োজন। তাই এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের মধ্যেও তিনি সুলতানকে কার্যকরী শাসক হিসাবে গণ্য করেন।

অধিকন্তু ইমামের বৈধ ও অবৈধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'এহইয়া'-তে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আমীরে ইসতি'লা' বা সামরিক সরকার যদিও মূলতঃ ক্ষতিকর, তথাপি এদের সাথে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যাতে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা না দেয় ও সমাজকে গৃহ যুদ্ধে নিপাতিত না করে।

তিনি দৃঢ়ভাবে এমত পোষণ করেন যে, যেকোন মূল্যে সভ্য মানুষের পক্ষে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতা থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কেননা এক দিনের অরাজকতা হাযার বছরের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে। অতএব তাঁর মতে, অরাজকতার ভয়াবহ পরিণতির চেয়ে স্বৈরাচারী শাসকের কিয়ৎ পরিমাণ অত্যাচার সহ্য করা মন্দের ভাল হিসাবে শ্রেয়।

তাঁর শাসনকর্তাদের প্রতি উপদেশের গ্রন্থ 'আত-তিবরুল মাসবূক', যা জাহিয-এর কিতাবুত তাজ এবং নিযামুল-মুলক

---

১. *শী'আরা প্রধানতঃ দু'টি শাখায় বিভক্ত। একটি শাখা ১২ ইমামে (اثنا عشرية) এবং অপরটি ৭ ইমামে (السبعية) বিশ্বাসী। সাত ইমামী শী'আদের ৭ম ইমাম হ'লেন ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফর ছাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল। তাঁর নামানুসারে এরা ইসমাঈলী শী'আ (اسماعيلية) নামে পরিচিত। এরা ইছনা আশারিয়াহ বা ১২ ইমামে বিশ্বাসীদের ৭ম ইমাম মূসা আল-কাযিমকে স্বীকার করেন না। তারা মনে করেন, ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মাদ অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তিনিই হলেন তাদের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী। এরা আল্লাহ্র একত্ববাদ, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাত এবং কুরআন মাজীদে বিশ্বাস করেন। তবে তারা মনে করেন, কুরআন মাজীদের অপ্রকাশ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। এজন্য এদেরকে 'বাতেনী' নামেও অভিহিত করা হয়। ইসমাঈলের পুত্র মুহাম্মাদের গায়েব হয়ে যাওয়ায় যারা বিশ্বাস করেন তারা 'কারামতী' (القرامطة) নামে এবং যারা তার মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন ও তার বংশের সাথে ইমামত সম্পৃক্ত মনে করেন তারা 'ফাতেমী' (الفاطمية) বলে পরিচিত। ভারতবর্ষের খাজা ও আগা খানী শী'আরা ইসমাঈলীদের দলভুক্ত (ইহসান ইলাহী যহীর রচিত 'আল-ইসমাঈলিয়াহ' বই দ্র.)। -গবেষণা বিভাগ, হাফাবা।]*

তূসীর 'সিয়াসতনামা'র নমুনায় লিখিত, তাতে ইমাম গাযালী বাদশাহীত্ব বা রাজত্ব আল্লাহ্র দান ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণ করেন এবং শত শত উপমা, উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করে বাদশাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ন্যায়বিচারের দিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান।

লক্ষণীয় যে, 'কিতাবুল ইক্বতিছাদ'-এ তাঁর আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইমামত ও খিলাফত। 'এহইয়াউ উলূম' এবং 'মুস্তাযহিরী'তে তিনি খলীফা ও সুলতানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষতঃ সেলজুক সুলতানদের দ্বারা খিলাফতের প্রতিষ্ঠানকে মুসলিম সমাজের একতার প্রতীক স্বরূপ একটি সাংবিধানিক কেন্দ্রবিন্দুতে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং সবার দৃষ্টি ইমামতের প্রতীকী প্রতিষ্ঠান থেকে, ইমাম বা খলীফার নিরাপত্তা বিধানকারী ক্ষমতাধর সুলতানের প্রতি ফিরাতে ও নিবদ্ধ করতে তিনি চেষ্টিত হন। আর 'আত-তিবরুল মাসবূক'-এ তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সুলতান থেকে 'মুলক' বা রাজত্বে অর্থাৎ বাদশাহীতে পরিবর্তিত করেন। প্রণিধানযোগ্য যে, সুলতান মৌল অর্থে প্রাপ্ত ক্ষমতা, তথা আল্লাহ্র নিকট থেকে রাসূল কর্তৃক প্রাপ্ত এবং রাসূলের নিকট থেকে খলীফা কর্তৃক প্রাপ্ত ও খলীফার নিকট থেকে প্রশাসক বা শাসনকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত।

তাই এতে স্তরে স্তরে শাসনকার্য পরিচালনার শর্তাবলী থাকে। কিন্তু মুলক বা রাজ্যের বেলায় তথা বাদশাহীতে উক্ত শর্তাবলীর ইঙ্গিত নেই। রাজার বা বাদশার ক্ষমতা মৌলিক বলে মনে করা হয়।

তাঁর রাজনীতি দর্শন :

ইমাম গাযালী তার 'ইক্বতিছাদ'-এ বলেন, ইমামত, তথা মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব, শরী'আতের আওতাধীন বা নিছক অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধিগত ব্যাপার (মুহিম্মাত) অথবা যুক্তি ও অধিবিদ্যা ভিত্তিক। চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি থেকে স্বতন্ত্র।

অতএব গ্রীক দর্শনের আদলে ইমামতের স্বরূপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা করার কোন অধিকার বা অবকাশ দার্শনিকদের নেই। কেননা ইমামত বা মুসলিম সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব যুক্তির চিন্তালব্ধ নয়; বরং নবুঅতের ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত ও শরী'আতের অনুশাসন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

কিতাবুল মুসতাযহিরীতে তিনি একথার পুনরাবৃত্তি করে বাতেনী ও দার্শনিকদের এ দাবী যে, ইমামত একটি যুক্তিগত ভাবে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, তথা যুক্তিলব্ধ প্রতিষ্ঠান। কেননা তাদের মতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতই মুসলিম সমাজ যুক্তিগতভাবে নেতৃত্ব বা ইমামতের বাধ্য করার শক্তি সম্পন্ন নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠান ছাড়া শান্তিতে বসবাস করতে পারে না... এ ধারণাটি খণ্ডন করেন।

ইমামত শরী'আতের আওতাভুক্ত হওয়ার ধারণায় তিনি ইমাম মাওয়ার্দীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। উভয়েই উল্লেখ করেন যে, ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম যুগের মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে এমনকি নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃতদেহ দাফন করার পূর্বেই নেতা নির্বাচিত করেন। আর তখন থেকে ইজমা ভিত্তিক মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যমত চলে আসছে যে, সরকারী কর্মকাণ্ড ও বিচার-আচারের প্রক্রিয়ার বৈধতা একজন সর্বজন স্বীকৃত ইমামের নিকট থেকে উৎসারিত হ'তে হবে।

কিতাবুল মুসতাযহিরীতে ইমাম গাযালী বলেন, 'মুসলিম সমাজের বা উম্মাহ্র নেতৃত্বের জন্য ইমামতের প্রয়োজন। কেননা এটা সুবিধাজনক ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, যা এ দুনিয়ার জীবনে ক্ষতি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। বরং এটা মুসলমানদের জীবনে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। কারণ এটা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা কায়েম ও চালু রাখার জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেয়'।

তিনি আরো বলেন, 'প্রণিধানযোগ্য যে, উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত, যা ইসলামে আইন-কানূনের একটি উৎস, তা একজন সর্বসাকুল্যে মান্যবর ইমামের নেতৃত্বে ছাড়া ইসলাম ধর্মকে ও এর কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়'।

আদতে ধর্মের কল্যাণকর ব্যবস্থার সংরক্ষণ একমাত্র দুনিয়ার কল্যাণকর ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব, যা এমন একজন ইমাম বা নেতার ইমামতের, তথা এমন নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল, যাকে সবাই মান্য করে'।

তিনি একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন এবং গাণিতিক যুক্তিতে অতুলনীয় দক্ষ ছিলেন, যা তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহাফুত আল-ফালাসিফা'তে প্রতিভাত হয়। তিনি যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি সূত্রায়ন করে বলেন, 'ধর্ম হ'ল ভিত্তি এবং ক্ষমতা হ'ল অভিভাবক'। তাঁর কথায় 'দ্বীন হ'ল ভিত্তি এবং সুলতান হ'লেন অভিভাবক'। এ সূত্রে তিনি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দ্বীন ও সুলতান জমজ' তথা ধর্ম ও রাজনীতি জমজ। অর্থাৎ উভয়ই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। উভয়ে একও নয়, ভিন্নও নয়। অন্য কথায়, ধর্ম ও রাজনীতি একই উৎস মূলে দু'টি সত্তা। কেননা ধর্মের মৌল বাহন হ'ল ইবাদত, যা তাক্বওয়ার উপর চলে এবং রাজনীতির মৌল বাহন হ'ল হিকমত, যা কৌশলের উপর চলে। ইবাদত কৌশলের ভিত্তিতে করা যায় না এবং রাজনীতি বা সিয়াসাত তাক্বওয়ার ভিত্তিতে অচল। কিন্তু উভয়ই সৎ উদ্দেশ্যের (মাওয়েযাতুল হাসানার) ভিত্তিতে পরিচালিত হ'তে হবে। তাই উভয়েরই উৎস এক তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

সুতরাং ইমাম গাযালীর প্রথম কথা হ'ল : মুসলিম উম্মাহ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইমামত অপরিহার্য এবং ইমাম নির্বাচন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। এই নির্বাচনকার্য একটি সম্মিলিত কর্তব্য বা ফরযে কিফায়াহ। যা 'আহলুল হাল্লে ওয়াল-আক্দ' কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জনসাধারণের বায়'আত গ্রহণ করার মাধ্যমে, ইজমার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। তিনি এ ব্যাপারে ইমাম মাওয়ার্দীর সাথে একমত।

তাঁর দ্বিতীয় কথা হ'ল, ইমামত যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ 'খিলাফত নবুঅতের প্রতিনিধিত্ব হওয়ার কারণে খলীফার কতগুলি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, যাতে তিনি তাঁর ক্ষমতাধীন জনসাধারণকে শরী'আতের নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি নীতিগতভাবে ইমাম মাওয়ার্দীকে অনুসরণ করেন। কেবল তার যুগের চাহিদা পূরণ করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইমামতের শর্তগুলি কিয়ৎ পরিমাণ শিথিল করেন মাত্র।

স্মর্তব্য যে, ৭৮৭ হিঃ/১০৯৪ খৃঃ আল-মুসতাযহির খেলাফতে আসীন হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। বাতেনীরা তাঁর নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসে। এতদসত্ত্বেও ইমাম গাযালী তাঁকে বৈধ ইমাম বলে মতামত প্রদান করেন। কেননা তাঁর মতে, প্রকারান্তরে তিনি প্রয়োজনীয় সব গুণাগুণের অধিকারী ছিলেন। বিশেষতঃ মহা ক্ষমতাধর, কার্যকর সামরিক শক্তির অধিকারী, সেলজুক সুলতানের সমর্থন পুষ্ট হওয়ায় তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বীকৃতি লাভ করেন।

ইমাম মাওয়ার্দীর মতে, জনগণের বায়'আত গ্রহণ করার মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি নিহিত আছে, যদ্বারা জনগণের প্রতি কতেক কর্তব্য সমাধা করার দায়িত্ব খলীফার উপর বর্তায় এবং অপর পক্ষে তাঁকে মান্য করার দায়িত্ব জনগণের উপর বর্তায়। ইমাম মাওয়ার্দী এ চুক্তিগত কর্তব্য সমাধা করার জন্য খলীফার মধ্যে সাতটি গুণ থাকার শর্ত আরোপ করেন, যেগুলি (১) ন্যায়বিচার (২) শরী'আতের জ্ঞান (৩) দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তির সুস্থতা (৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা (৫) কিফায়া অর্থাৎ প্রশাসনিক দক্ষতা (৬) জিহাদ বা যুদ্ধের উপযুক্ত সাহসিকতা ও সামর্থ্য (৭) কুরাইশ বংশীয় হওয়া। তদুপরি ইমাম মাওয়ার্দী খলীফার দশটি কর্তব্য নির্দেশ করেন। যথা- (১) ধর্মকে সমুচ্চ রাখা (২) শরী'আতের রায় কার্যকরী করা (৩) মুসলিম সমাজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা (৪) কুরআনের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা (৫) সীমান্ত রক্ষা করা (৬) ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা (৭) বৈধ জিযিয়া, ফায় ও যাকাত সংগ্রহ করা (৮) কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা (৯) উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য লোককে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা এবং (১০) সরকারী ও ধর্মীয় কার্যাদি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করা।

কিতাব আল-মুসতাযহিরীতে ইমাম গাযালী অনুরূপ কতেক গুণাগুণ ও শর্তাবলীর অবতারণা করেন। তন্মধ্যে ছয়টি দৈহিক ও চারটি নৈতিক, যথা- (১) বয়োপ্রাপ্তি (২) সুস্থ মস্তিষ্ক (৩) স্বাধীনতা (৪) পুরুষ হওয়া (৫) কুরায়শী হওয়া (৬) সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং (১) সাহসিকতা (২) প্রশাসনিক দক্ষতা (৩) আল্লাহভীরুতা (৪) শরী'আতের জ্ঞান।

তবুও আল-মুসতাযহিরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও সেলজুকদের মোকাবিলায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম গাযালী জোর দিয়ে তাঁকে প্রকারান্তরে সবগুণের অধিকারী বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ তাঁর কুরাইশী বংশ সঠিক, পক্ষান্তরে মিসরের ফাতেমী খলীফাদের কুরাইশী বংশ তালিকা মেকী।

দ্বিতীয়তঃ সাহসিকতা ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে, তিনি বলেন, সেলজুক সুলতানের আনুগত্য ও সামরিক শক্তির সহায়তা এবং খলীফার প্রতি সমর্থন এর জন্য যথেষ্ট। এমনকি কখনো কখনো খলীফার প্রতি তাদের অবাধ্যতা প্রদর্শন বা তাদের অধিকারের সীমালংঘন ঘটে থাকলেও খলীফার প্রতি তাদের আনুগত্য অবিচল। কেননা তারা খলীফাকে রক্ষা করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন। ইতিপূর্বে খলীফা কখনো এরূপ একটি সহায়ক শক্তি নিজেদের সান্নিধ্যে পাননি।

তৃতীয়তঃ প্রশাসনিক দক্ষতার ব্যাপারে তিনি বলেন, খলীফা মুসতাযহির বিচক্ষণতা ও দৃঢ় চিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁর মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করার সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছেন।

চতুর্থতঃ আল্লাহভীরুতা বা ধর্মভীরুতার ব্যাপারে আন্তরিকতা যা মানুষের সর্বোচ্চ গুণ বলে পরিগণিত হয়, তা আল-মুসতাযহিরের মধ্যে সততই বিদ্যমান। তিনি পুণ্যময় রীতিনীতি ও কৃচ্ছতা সহকারে ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেন এবং সক্রিয়ভাবে ইসলামী কর্তব্য ও অনুষ্ঠানাদি পালন করেন। তিনি সরকারী তহবিল, একমাত্র অনুমোদিত সরকারী ও ধর্মীয় খাতে ব্যয় করেন। তিনি বলেন, যদিও তাঁকে দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে বলা যায় না, যেমন বাতেনী সম্প্রদায় তাদের ইমামের নিকট প্রত্যাশা করে, যেরূপ প্রত্যাশা করা অবশ্যই মানব প্রকৃতির বিপরীত হবে। এমনকি বিজ্ঞ লোকেরা দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নবীদের পক্ষেও কি পরিমাণ সম্ভব তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন।

পঞ্চমতঃ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে ইমাম গাযালী 'মুজতাহিদ' হওয়ার জন্য অতি উচ্চ ধর্মীয় জ্ঞান ও ফিক্বহ বিদ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। বরং ইমামতের জন্য ফৎওয়া বা ফিক্বহ সম্মত রায় প্রদান করার যোগ্যতাই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন।

তিনি স্বীকার করেন যে, আল-মুসতাযহির একজন যুবক মাত্র এবং মুজতাহিদ-এর যোগ্যতা সম্পন্ন নন। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করেন, কুরাইশ বংশীয় অনুরূপ মর্যাদা সম্পন্ন অন্য কোন প্রার্থী তাঁর মত আছে কি? অতএব আল-মুসতাযহির এর ইমামতের বৈধতা একদিকে জনগণের স্বীকার করে নেয়া উচিত এবং অন্যদিকে তাঁর পক্ষে সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়ে সর্বাধিক বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়। যাতে তাঁর ধর্মীয় ও ফিক্বহ সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিসর বর্ধিত হয়।

ষষ্ঠতঃ ইমাম গাযালী, আল-মাওয়ার্দীর মত খলীফার করণীয় কর্তব্যাদির ফিরিস্তি প্রদান করেননি। আর এরূপ কর্তব্য পালনে মুসলিম সমাজের প্রতি খলীফার চুক্তিগত কর্তব্যের কথাও

উল্লেখ করেননি। স্পষ্টতঃ ইমাম গাযালী খলীফার পদটিকে মুসলিম সমাজের একমাত্র প্রতীক হিসাবে গণ্য করেন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেন।

অতএব ইমাম গাযালীর যুক্তি তর্কে, ড. ব্যাগলীর (Bagley) মতে, খলীফার পক্ষে সামরিক বা প্রশাসনিক অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার ক্ষমতাধর সরকারী কার্য নির্বাহ করার প্রত্যাশা তিনি করেন না। কারণ সাংবিধানিক উপায়ে তুর্কী সেলজূকরা, ক্ষমতাধর ওয়াযীরেরা, সচিবেরা এবং আলেমরা এসব প্রশাসনিক কর্ম নিষ্পন্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

সপ্তমতঃ 'আত-তিবরুল মাসবূক' বা নছীহাতুল মুলূক (রাজা-বাদশাদের প্রতি উপদেশ) গ্রন্থে ইমাম গাযালী সুলতান-এর উপর প্রাচীন ইরানী শাহদের ও বিগত যুগের খলীফাদের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেন এবং সুলতানকে উপদেশ দেন যেন তিনি ঐসব পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজে কল্যাণকর ন্যায়নিষ্ঠ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এতদসঙ্গে তিনি সামরিক ক্ষমতাধারী, প্রশাসক ও আলেমদেরকে বৈধ খলীফার প্রতি আনুগত্য পোষণ করার ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইসলামের খাতিরে একযোগে কাজ করার উপদেশ দেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইমাম মাওয়ার্দীর মত সমসাময়িক খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে তিনি সুলতানকে আত-তিবরুল মসবূকে একটি কথাও বলেননি। অবশ্য কিতাব আল-মুসতাযহিরীতে তিনি খলীফাকে 'শওকতের' অধিকারী অর্থাৎ শক্তিধর সুলতানের নিকট এ শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উপদেশ দেন যে, এর প্রতিদানে ক্ষমতা গ্রহণকারী সুলতান যেন তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। কেননা শাসন -প্রশাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা খলীফার হাতে ন্যস্ত, যিনি 'আহলুল হাল্লে ওয়াল আক্দ' এর সমর্থন ও আনুগত্যের দাবীদার।

তিনি খলীফাকে ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার উপদেশ দেন। কেননা তিনি শরী'আত অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে ও শরী'আত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করলেই কেবল জনগণের আনুগত্য লাভ করতে পারেন।

তিনি পূর্ববর্তী ধর্মীয় শিক্ষক ও ইমামদের প্রদত্ত শাসকদের প্রতি উপদেশাবলীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করার জন্যও খলীফাকে উপদেশ দেন।

বাস্তবতার উচ্চ স্তরে ইমাম গাযালী সুলতান কর্তৃক খলীফা মনোনয়ন করার সমসাময়িক প্রথার বৈধতা স্বীকার করেন। 'এহইয়াউ উলূম'-এ তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আব্বাসীয় খলীফাগণ ইমামতের চুক্তি মূলে বৈধ পদাধিকারী এবং এর সমগামী দায়িত্বের বাহক। কিন্তু সরকারের কাজকর্ম সুলতান কর্তৃক পরিচালিত, যিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। কেননা সরকার হ'ল ওঁদের হাতে যাঁরা সামরিক শক্তির সমর্থনপুষ্ট এবং খলীফা হ'লেন যিনি ক্ষমতাধরের আনুগত্য লাভ করে থাকেন।

যে যাবত খলীফার ক্ষমতা সরকার স্বীকার করে নেয়, সে যাবত সরকার বৈধ। অন্যথায় সরকার যদি গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অবৈধ, অরাজকতা সম্পন্ন ও আইন বহির্ভূত। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও কল্যাণ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। সে কারণ তিনি এমনকি কোন স্বৈরতন্ত্রী সুলতানকেও ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতি খলীফা কিংবা জনগণকে উৎসাহ দিতে নারাজ ছিলেন।

বাস্তবে সুলতান হ'ল সার্বিক নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী, যিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী এবং খলীফার বিশেষ ক্ষমতাবলীর অনুমোদনকারী, যিনি খলীফার নাম খুতবায় ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন ও টাকা-পয়সায় খচিত করেন। তিনি যেসব অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন, তাঁর আদেশ ও বিচার সেসব স্থানে যথার্থই বৈধ।

অতএব ইমাম মাওয়ার্দীর যুগে যে ক্ষমতাধারী আমীরকে, আমীরে ইছতিলাহ উপাধি দিয়ে বৈধ করা হয়েছিল, ইমাম গাযালীর যুগে তাঁকে সুলতান উপাধি দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা বলে স্বীকৃতি দান করা হয়।

[প্রবন্ধটি ৭.২.১৯৯৩ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' (আইবিএস)-এর সেমিনারে পঠিত।]

লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আবেদন

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

লালমণিরহাট যেলার আহলেহাদীছ ভাই-বোনদের দীর্ঘদিনের আকাংখা লালমণিরহাট শহরে একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে লালমণিরহাট শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০ শতাংশ জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১০০,০০,০০০/=(এক কোটি) টাকা। অতএব দানশীল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং-০২০০০১৫২৫২৩১৪
অগ্রণী ব্যাংক, লালমণিরহাট শাখা। (২) বিকাশ নং-০১৮৫১-৮৩৯২২২।

সার্বিক যোগাযোগ : প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক, মসজিদ বাস্তবায়ন কমিটি।
মোবাইল নং ০১৭১২-৯৯১১৩৮; ০১৭২৩-৩১৩৫৯৫।

ছাহাবী ও তাবেঈগণের যুগে মহামারী ও তা থেকে শিক্ষা

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির উপর শাস্তি কিংবা পরীক্ষাস্বরূপ নানারূপ মহামারী প্রেরণ করেন। আর এই মহামারী কখনও সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরও নেমে আসতে পারে।[১] এতে মুমিনদের জন্য যেমন শিক্ষা রয়েছে, তেমনি আত্মসংশোধনেরও সুযোগ রয়েছে।[২] তাছাড়া এটি মুমিনদের জন্য রহমতও বটে। কারণ এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মুমিন শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।[৩] ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগেও বহু মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, যার অধিকাংশ ছিল সিরিয়া ও ইরাক জুড়ে। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম এটিকে তাদের জন্য অভিশাপ মনে করতেন না। বরং তারা মনে করতেন, এটি রাসূল (ছাঃ)- এর দো'আ, যা কাফেরদের আঘাতে মৃত্যু থেকে রক্ষার উপায়।[৪] নিম্নে ইতিহাসের পাতা থেকে এসকল মহামারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হ'ল।

পৃথিবীর বুকে প্রথম মহামারী : পৃথিবীতে প্রথম মহামারী এসেছিল ইহুদীদের উপর, যখন তারা যুলুম করছিল।[৫] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ত্বা'ঊন বা মহামারী হ'ল এক রকমের আযাব। এই ত্বা'ঊন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল। তাই তোমরা কোন জায়গায় ত্বা'ঊন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাক সেখানে মহামারী শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না।[৬] ত্বীবী বলেন, 'তারা হচ্ছে ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন দরজার ভিতরে প্রবেশের সময় সিজদাবনত হ'তে। কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ 'আমরা তাদের উপর আসমান হ'তে আযাব পাঠিয়ে দিলাম' *(আ'রাফ ৭/১৬২)*। ইবনু মালিক বলেন, 'তাদের ওপর মহামারীকে আযাব হিসাবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চব্বিশ হাযার শীর্ষস্থানীয় ইহুদী মারা যায়।[৭]

রাসূলের যুগে মহামারী : রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে মক্কা ও মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত পূর্বকালে মদীনা ছিল মহামারী প্রবণ এলাকা। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর বরকতে তা উঠে যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) মদীনায় শুভাগমন করলে আবুবকর ও বেলাল (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর আবুবকর (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেন যে, كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِى أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ 'প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের মাঝে দিনাতিপাত করছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা অপেক্ষা সন্নিকটে'। আর বেলাল (রাঃ) জ্বর থেকে সেরে উঠলে উচ্চৈঃস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন, 'হায়, আমি যদি কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম আর আমার চারদিকে থাকত ইযখির এবং জালীল ঘাস। মাজান্না ঝর্ণার পানি পানের সুযোগ কখনো হবে কি? আমার জন্য শামা এবং ত্বফীল পাহাড় প্রকাশিত হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনু রাবী'আ, উতবা ইবনু রাবী'আ এবং উমাইয়াহ ইবনু খালাফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর। যেমনভাবে তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি হ'তে বের করে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। এরপর রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا، وَفِى مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ 'হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ছা' ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। এখানকার জ্বরের প্রকোপকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহ্র যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক মহামারী প্রবণ এলাকা'।[৮]

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মক্কা-মদীনায় কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব না ঘটলেও ইরানে ৬ষ্ঠ হিজরী তথা ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির বলেন, لم يكن طاعون أشد من ثلاثة طواعين طاعون الجارف، أزدجرد وطاعون عمواس وطاعون 'তিনটি মহামারীর চেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক মহামারী আর ছিল না। সেগুলো হ'ল আয্দাজার্দ মহামারী, আমওয়াস মহামারী ও জারেফ মহামারী'।[৯] ইরানের সেই মহামারীতে কত সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছিল তা জানা যায় না। এটি শীরাওয়াইহ্ মহামারী নামেও পরিচিত যার প্রাদুর্ভাব মাদায়েন শহরে ঘটেছিল।[১০] তবে ঐতিহাসিক আছমাঈ ও আবু আইউব সাখতিয়ানী ১৬ হিজরী সনে ত্বাঊনে শেরওয়াইহ বিন কিসরায় প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন *(আহমাদ আল-'আদাবী, আত-ত্বাঊন ফী আছরিল উমাভী)*।

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৯০-৯৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৪; ফাৎহুল বারী ৭/৯৯; ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা ৭/৩৯৯।*
২. *ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩১; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৩, সনদ ছহীহ।*
৪. *মুসনাদে আহমদ হা/১৫৬৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৫।*
৫. *বাক্বারাহ ২/৫৯; তাফসীরে তাবারী হা/১০৪০, ২/১১৭।*
৬. *বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; মিশকাত হা/১৫৪৮।*
৭. *মোল্লা আলী কারী, মিরক্বাত ৩/১১৩৩, হা/১৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৮. *বুখারী হা/১৯৮৯; মুসলিম হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২৭৩৬।*
৯. *তারীখে দিমাশক ৫৮/৩৩৬।*
১০. *নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬।*

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে মহামারী :

(১) আমওয়াস মহামারী : ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১৮ সনে শামে (বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তীন ও লেবানন) এই মহামারী সংক্রমিত হয়। ওমর (রাঃ) তখন ইসলামী বিশ্বের খলীফা। তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে জানতে পারেন যে, সেখানে মহামারী প্লেগ দেখা দিয়েছে। সেটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর রাষ্ট্রীয় সফর। মদীনা থেকে শামে অবস্থিত হেজাযের পাশে 'সারগ' গ্রামে ওমর (রাঃ) পৌঁছলে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ও অন্যান্য সেনাপতিগণের সঙ্গে দেখা হয়। তারা ওমর (রাঃ)-কে অবহিত করেন যে, শামে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ওমর (রাঃ) তখন ছাহাবীদের কাছে এ মর্মে পরামর্শ চান যে, তিনি শামে সফর করবেন, নাকি মদীনায় ফিরে যাবেন? এ নিয়ে ৩টি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়- প্রথমটি ছিল মুহাজির ছাহাবীদের পরামর্শ। এতে কিছু ছাহাবী মতামত দিলেন যে, আপনি যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, সে উদ্দেশ্যে সফর অব্যাহত রাখেন। অর্থাৎ শামে যাওয়ার পক্ষে মত দেন। আবার কিছু ছাহাবী বললেন, খলীফার সিরিয়া যাওয়া উচিত হবে না।

দ্বিতীয় ছিল আনছার ছাহাবীগণের পরামর্শ সভা। ওমর (রাঃ) আনছার ছাহাবীদের কাছ থেকেও মুহাজিরদের মত বিপরীতমুখী দু'টি মতামত পেয়ে তাদেরকেও চলে যেতে বললেন।

সর্বশেষ ছিল মক্কা বিজয়ের পরে হিজরতকারী প্রবীণ কুরাইশদের একটি দল। তাদের নিকটে খলীফা ওমর (রাঃ) পরামর্শ চাইলে তারা এক বাক্যে বলে দিলেন, 'শাম সফর স্থগিত করে আপনার মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আপনি আপনার সঙ্গীদের মহামারী প্লেগের দিকে ঠেলে দিবেন না। ওমর (রাঃ) প্রবীণ কুরাইশদের মতামত গ্রহণ করে শাম সফর স্থগিত করে মদীনায় ফিরে গেলেন। খলীফার মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেখে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর থেকে পলায়ন করে ফিরে যাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্র দেওয়া এক তাক্বদীর থেকে আরেক তাক্বদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি।' ওমর (রাঃ) সেনাপতি আবু ওবায়দাহকে এ কথা বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ পেশ করলেন। তিনি বলেন, 'তুমি বলত, তোমার কিছু উটকে তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে গেলে যেখানে দু'টি মাঠ আছে। মাঠ দু'টির মধ্যে একটি মাঠ সবুজ-শ্যামলে (তৃণলতায়) ভরপুর। আর অন্য মাঠটি একেবারে শুষ্ক ও ধূসর। এ ক্ষেত্রে তুমি কোন মাঠে উট চরাবে? এখানে উট চরানোর বিষয়টি কি এমন নয় যে, যতি তুমি সবুজ-শ্যামল মাঠে উট চরাও। তবে তা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, সেটিও আল্লাহ্র তাক্বদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ।

এ সময় আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، 'তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারী প্লেগের বিস্তারের কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে অবস্থান কর, তাহ'লে সেখান থেকে বের হবে না'। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অতঃপর সবাই ফিরে গেলেন।[১১]

উল্লেখ্য, ফিলিস্তীনের আল-কুদস ও রামাল্লার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল হ'ল আমওয়াস বা ইমওয়াস। সেখানে প্রথমে প্লেগ রোগ প্রকাশ পায়। অতঃপর তা পুরো শামে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাস এটি 'ত্বাঊন আমওয়াস (طاعون عمواس) নামে পরিচিত।

মোল্লা আলী ক্বারী উল্লেখ করেন, এ সময় তিন দিনে সত্তর হাযার মানুষ মারা যায় *(মিরক্বাত ৮/৩৪১১)*। এই মহামারীতে প্রসিদ্ধ ষোলজন ছাহাবীসহ ২৫-৩০ হাযার মুসলিম সৈন্য মৃত্যুবরণ করেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্‌রাহ, মু'আয বিন জাবাল, তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তান, রাসূলের মুআয্যিন বেলাল বিন রাবাহ, চাচাত ভাই ফযল বিন আব্বাস, ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান, সেনাপতি শুরাহ্বীল বিন হাসানাহ, হারেছ বিন হাশেম, সুহায়েল বিন আমর ও তার ছেলে আবু জান্দাল বিন সুহায়েল, গায়লান বিন সালামা, আব্দুর রহমান বিন আওয়াম, 'আমের বিন মালেক, 'আমর বিন ইবনু উম্মে মাকতূমসহ অনেকে। সেনাপতি আবু ওবায়দাহ মারা গেলে সেনাপতির দায়িত্ব পান মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)। তিনিও মারা গেলে দায়িত্ব নেন 'আমর ইবনুল আছ (রাঃ)। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এরই মধ্যে ত্রিশ হাযার সৈন্য মারা যায়।[১২] এই মহামারীতে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের ৪০ জন সন্তান মারা যায়। তখন তারা সবাই সিরিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন।[১৩]

এই মহামারীর পর মুসলিম বিশ্বে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। ওমর (রাঃ) জনগণের কাছে খাবার পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং তিনি সকল প্রকারের উন্নতমানের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। আবু ওছমান আন-নাহদী (রহঃ) বলেন, আমরা আজারবাইজানে ছিলাম। এ সময় ওমর (রাঃ) আমাদের (দলনেতার) কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবাহ ইবনু ফারকাদ! এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেরূপ নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ কর, তেমনিভাবে মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও পেটপুরে আহার করাও। আর সাবধান, মুশরিকদের ভোগ-

---

১১. *বুখারী হা/৫৭২৯; মুসলিম হা/২২১৯; নববী, শরহ মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

১২. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/৯০-৯৬; তারীখুল ইসলাম ৩/১৭৪; ফাৎহুল বারী ৭/৯৯; ইবনু সা'দ ৭/৩৯৯।*

১৩. *ইবনু হাযম, জামহারাতু আনসাবিল আরব ১/১৪৮; আবুল হাসান সামহুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা ২/২৪৪।*

বিলাস, বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন'।[১৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) দুর্ভিক্ষের বছর পল্লী অঞ্চলের বেদুঈনদের নিকটে উট, খাদ্যশস্য ও তৈল প্রভৃতি সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খণ্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি। তাঁর এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। ওমর (রাঃ) দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌঁছে দিন'। তাঁর ও মুসলমানদের দো'আ আল্লাহ কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হ'লে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্র শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি সচ্ছল মুসলমান পরিবারের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার দ্বারা দু'জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে।[১৫]

(২) ২৪ হিজরীর মহামারী : এই মহামারী মিসরে দেখা দেয়। এই মহামারীতে কবি আবু যুওয়াইব আল-হুযালীর পাঁচজন সন্তান মারা যায়। এই মহামারীর উৎস সম্পর্কে ইবনু বাত্তা আকবরী বলেন, এই মহামারী প্রথম 'দাব' নামক স্থানে দেখা যায়। তখন শামের শাসক ছিলেন মু'আবিয়া (রাঃ)। তিনি ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবুদ্দারদা (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন, হে মু'আবিয়া! তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন কিভাবে যাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে গেছে? এরপরে মহামারী হিমছ ও দামেশকে ছড়িয়ে পড়ে। মু'আবিয়া (রাঃ) অন্যত্র চলে যান। এরই মধ্যে এই মহামারী মিসরে ছড়িয়ে পড়ে।[১৬]

(৩) কূফার মহামারী : আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) দু'বার কূফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে কূফায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এটি হিজরী ৪৪ সনের পূর্বে ঘটেছিল। কারণ তিনি ৪৪ হিজরী সনে মারা যান।[১৭] ঐতিহাসিকগণ এই মহামারীর কথা উল্লেখ করলেও সাল উল্লেখ করেননি। ছাহাবী তারিক বিন শিহাব বাজালী (রাঃ) বলেন, أَتَيْنَا أَبَا مُوسَى وَهُوَ فِي دَارِهِ بِالْكُوفَةِ لِنَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ: لَا تَخْرُجُوا فَقَدْ أُصِيبَ فِي الدَّارِ إِنسان بِهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عَنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَتَخْرُجُوا فِي فَسِيحِ بِلَادِكُمْ وَنُزَهِهَا، حَتَّى يَرْتَفِعَ هَذَا الْبَلَاءُ، 'মহামারীর সময়ে আলোচনা করার জন্য কয়েকজন লোকসহ আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন তার কূফার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। সেসময় তিনি কূফার গভর্নর। আমরা সঙ্গীদের নিয়ে যখন বসতে গেলাম, তখন আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলে উঠলেন, আপনারা নগ্নপায়ে হাঁটবেন না। কারণ এ ঘরে একজন লোক মহামারীতে আক্রান্ত। আর মহামারীর প্রাদুর্ভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের জন্য এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিজ দেশের প্রশস্ত যমীনে ও তার মুক্ত বাতাসে গমন করাও সমীচীন হবে না।[১৮]

(৪) ৪৯/৫০ হিজরীর মহামারী : ৪৯ হিজরীতে কূফায় এক ভয়াবহ মহামারী আঘাত হানে। এতে ছাহাবী মুগীরা বিন শু'বাহ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। কূফায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মুগীরা বিন শু'বাহ (রাঃ) সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। যখন শুনতে পান যে মহামারী দূর হয়েছে তখন তিনি কূফায় ফিরে আসেন। কিন্তু মহামারী তখনও কিছুটা বিদ্যমান ছিল। ফলে তিনি সে মহামারীতেই আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[১৯]

(৫) ৫৩ হিজরীর মহামারী : এই মহামারী ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম মহামারী হিসাবে পরিচিত। এতে যিয়াদ বিন আবীহ তথা যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ান মারা যায়। এই যিয়াদ বিন আবীহ বছরা ও কূফার ক্ষমতা গ্রহণ করে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেন যে, আমাকে এখন হেজাযের আমীর নিযুক্ত করা হোক। এই চিঠির কথা মদীনাবাসী বিশেষ করে ইবনু ওমর (রাঃ) জানতে পারলে তার বিরুদ্ধে বদদো'আ করেন। এরপরেই সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।[২০]

(৬) মিসরীয় মহামারী : হিজরী ৬৬ সনে মিসরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেন, এই মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মিসরের আমীর আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান পলায়ন করে মরুভূমিতে অবস্থিত হুলওয়ান নামক একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ঐ গ্রামেই মারা যান। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি ৮৫ হিজরীর মহামারীতে হুলওয়ানে মারা যান'।[২১]

(৭) জারেফ মহামারী : ৬৯ হিজরীর শাওয়াল মাসে এই মহামারী শুরু হয়। ইতিহাসে এটি 'ত্বাউনে জারেফ' নামে পরিচিত। এ সময় মক্কা ও মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)। মুসলিম বিশ্বে তখন উমাইয়া শাসন চলছিল। তবে মক্কা-মদীনা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নিয়ন্ত্রণে। মক্কা-মদীনার শাসনকে কেন্দ্র করে বনু উমাইয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর মধ্যে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে, তখন বছরায় দেখা দেয় ইতিহাসের এই ভয়াবহতম মহামারী। 'জারেফ' অর্থ হ'ল 'সর্বসংহারী'। অন্য অর্থে

---

১৪. মুসলিম হা/২০৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/২২০৩।
১৫. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৬২, সনদ ছহীহ।
১৬. কিতাবুল ইবানাহ হা/১৮১৭, ২/২২৬; ইবনুল ক্বাইয়িম, শেফাউল আলীল ১/২১।
১৭. হাফেয ইবনু হাজার, বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত ত্বাঊন ৩৬২ পৃঃ।
১৮. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখে তাবারী ২/৪৮৭; তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলক ২/৩৩৯; আল-বিদায়াহ ৭/৭৮, ৭/৯০।
১৯. তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক ৩/১৮৫; আল-বিদায়াহ ৮/৩৭; আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৫৭; আল-কামেল ফিত তারীখ ২/১২৬; মাসূদী, মুরূজুয যাহাব ১/৩৫৮।
২০. আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৫৭; তারীখুল ইসলাম ৪/২১০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/৪৯৬।
২১. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযেরা ফী আখবারে মিসর ওয়াল ক্বাহেরাহ ১/৩০৫; বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬২।

'জারেফ' মানে নিষ্কাশনকারী। বানের পানি যেভাবে সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তদ্রূপ এই মহামারীও সব মানুষকে নিয়ে গিয়েছিল।[২২] যাতে মাত্র চারদিনে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ মারা যায়। স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মহামারীতে মারা যায় বলে এর নাম হয় 'জারেফ'।[২৩]

এই মহামারীতে আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর তিরাশিজন সন্তান ও আব্দুর রহমান বিন আবুবকরের চল্লিশজন সন্তান মারা যায় *(নববী, শারহু মুসলিম ১/১০৬)*। এতে আরো মারা যায়, ইয়াকূব বিন বুজায়ের, কায়েস বিন সাকান, আহনাফ বিন কায়েস, মালেক বিন ইখামের, হাস্সান বিন ফায়েদ, মালেক বিন আমের ও হুরাইছ বিন কাবীছাহ,[২৪] প্রসিদ্ধ নাহুশাস্ত্রবিদ ইমাম আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী (রহঃ)[২৫] প্রমুখ বিদ্বান মারা যান।[২৬]

ইবনু আবীদ্দুনিয়া বলেন, মৃতের হার এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, লাশ দাফন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন হিংস্র প্রাণীগুলো এসে লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তাদের থেকে লাশ হেফাযত করতে বাড়ির ভিতরে সবার লাশ রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল।[২৭]

(৮) আশরাফ মহামারী : হিজরী ৮৬ সনে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই মহামারীতে বহু সম্মানিত মানুষ মারা যান বলে একে 'ত্বাঊনে আশরাফ' বলে। এই মহামারী বা এর কিছুদিন পরে খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মারা যান। এছাড়াও এতে উমাইয়া বিন খালেদ, আলী বিন আছমা' ও ছা'ছা বিন হেসানসহ বহু লোক মারা যায়। মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তৎকালীন সময়ে একটি প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছিল যে, لا يكون الطاعون والحجاج في بلد واحد 'মহামারী ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক স্থানে থাকতে পারে না'। কারণ বহু মানুষ হত্যাকারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সে সময় ভিন্ন শহর ওয়াসেত্বে অবস্থান করছিলেন।[২৮]

(৯) ফাতায়াত মহামারী : ৮৭ হিজরী মোতাবেক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ফাতায়াত মহামারী। যাকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'আশরাফ মহামারী' নামেও অভিহিত করেছেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামলে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এটি শাম থেকে ইরাকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহামারীতে প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল কুমারী ও যুবতী নারীরা এবং এতে বহু যুবতী ও কুমারী নারী মারা যায় বলে একে 'ত্বাঊনে ফাতায়াত' বলা হয়।[২৯] আবুল বাহার বাকরাভী তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আমরা ফাতায়াত মহামারী থেকে পলায়ন করে সিনাম (سنام) নামক স্থানের পাশে অবস্থান নিলাম। এরই মধ্যে জনৈক আরব ব্যক্তি দশ সন্তানসহ আগমন করল। আমাদের থেকে একটু দূরে তারা অবস্থান নিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার দশ সন্তানই মারা গেল। তাকে দেখেছি সে কবরের পাশে বসে বসে শোক গাঁথা পাঠ করছিল।[৩০] আইয়ূব বিন সুলায়মান বিন আব্দুল মালেক স্বপরিবারে একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। উক্ত মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সবাই মারা যান।[৩১] এই মহামারীতে মারা যান প্রসিদ্ধ তাবেঈ ও হাদীছ বর্ণনাকারী উমাইয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন মুতার্রিফ বিন শিখ্খীর।[৩২]

(১০) আদী বিন আরত্বাতের মহামারী : ১০০ হিজরী সনে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। তৎকালীন বছরার গভর্নর আদী বিন আরত্বাতের নামে এর নামকরণ করা হয়। তিনি ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আযীয কর্তৃক নিযুক্ত বছরার গভর্নর।[৩৩] এই মহামারী খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে হয়েছিল। আদির পিতা আরত্বাত বলেন, 'লোকেরা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে অনুরোধ জানাচ্ছিল যে, তাঁর জন্য যেন খাদ্য-সামগ্রী মজুদ রাখা হয় এবং তার জন্য একজন দেহরক্ষী নিয়োগ করা হয়, যে ছালাতে পাহারা দিবে ও তাকে বহিরাক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিবে। তারা আরো দাবী জানায় যে, তিনি যেন মহামারী থেকে রক্ষা পেতে একাকী অবস্থান করেন যেমনটি পূর্ববর্তী খলীফাগণ করতেন। তখন তিনি বললেন, এখন তাঁরা (খলীফারা) কোথায়? তবুও তারা পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি জান আমি ক্বিয়ামত দিবস ব্যতীত অন্য কোন দিবসকে ভয় করি, তাহ'লে তুমি আমার ভয়কে বিশ্বাস কর না'।[৩৪]

(১১) ১০৭ হিজরীর মহামারী : হাফেয ইবনু কাছীর ও হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, ১০৭ হিজরীতে শামে ভয়াবহ মহামারী দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারা কোন ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ করেননি। ইবনু কাছীর বলেন, وَفِيهَا وَقَعَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ شَدِيد 'আর এই সালে শামে ভয়াবহ প্লেগ মহারামীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।[৩৫]

(১২) ১১৫ হিজরীর মহামারী : ১১৫ হিজরীতে শামে আবারো মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, فَفِيهَا وَقَعَ طَاعُونٌ بِالشَّامِ 'এই সালে শামে প্লেগ

---

২২. ফাৎহুল বারী ১/৯৭; শরহ মুসলিম ১/১০৫।
২৩. শরহ মুসলিম ১/১০৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৮।
২৪. তারীখুল ইসলাম ৫/৬৭।
২৫. ওয়াফিয়াতুল আইওয়ান ২/৫৩৯।
২৬. আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৭২।
২৭. আল-ইতিবার হা/৩৩, ১/৫৮; বাদায়েঈয যুহুর ১/৫২৯।
২৮. ইবনু কুতায়বাহ, আল-মা'আরেফ ১/১৩৫; আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/৯; নববী, শরহ মুসলিম ১/১০৬; আল-আযকার ১/১৫৪।
২৯. বাযলুল মাঊন ফী ফাযলিত তাঊন ১/৩৬৩।
৩০. ইবনু আবিদ্দুনিয়া. আল-ইতিবার হা/৩৭, ১/৬০।
৩১. আল-ইতিবার হা/২৩, ১/৪৪।
৩২. ইবনু হিব্বান, মাশাহিরু ওলামাইল আমছার ৯১ পৃ: আছ ছিক্বাহ ৪/৪০,৫/৬; আন-নুজূমুয যাহেরাহ ১/২১৪।
৩৩. তারীখে দিমাশ্ক ৪০/৬০।
৩৪. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৫/৩৯৮; তারীখে দিমাশ্ক ৪৫/২৪৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/১৩৯; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২৯২; তারীখুল ইসলাম ৭/২০২; তারীখুল খোলাফা ১/২০১।
৩৫. আল-বিদায়াহ ৯/২৪৪; বাযলুল মাঊন ফি ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬৩।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে।[৩৬] এটি শামের প্রথম মহামারী নামেও পরিচিত। এটি ১১৪ হিজরী সনে ছড়িয়েছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন।

(১৩) ওয়াসেত্ব মহামারী : ১১৬ হিজরী সনে ইরাকের 'ওয়াসেত্ব' নামক স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। যা শাম, ইরাক বিশেষ করে ওয়াসেত্ব শহরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। ইবনু কাছীর বলেন, وفيها وقع طاعون عظيم بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَكَانَ مُعْظَمُ ذَلِكَ فِي وَاسِطَ. 'আর এই সনে শাম ও ইরাকে ভয়াবহ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর এটি ওয়াসেত্বে আরো ভয়াবহ ছিল।[৩৭] এজন্য এটি ইতিহাসে 'ত্বাঊনে ওয়াসেত্ব' নামে পরিচিত। এই মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

(১৪) গুরাব মহামারী : ১২৭ হিজরীতে গুরাব মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। গুরাব ছিল সে সময়ের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির নাম। এই মহামারীতে সবার আগে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। তাই তার নামে এই মহামারীর নামকরণ করা হয়। উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আব্দুল মালেকের সময় এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে।[৩৮] আছমাঈ বলেন, وكانَ طَاعُونٌ خَفِيفٌ يُقَالُ لَهُ طَاعُونُ غُرَابٌ، وكانَ خَفِيفًا، فِي سَنَةِ سَبْعٍ وعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. 'আর ত্বাঊনে গুরাব ছিল তুলনামূলক কম ধ্বংসাত্মক। এটি হালকা প্রকৃতির ছিল যা ১২৭ হিজরীতে ছড়িয়ে পড়েছিল'।

(১৫) ১৩১ হিজরীর মহামারী : ১৩১ হিজরীতে ত্বাঊনু মুসলিম বিন কুতাইবার প্রাদুর্ভাব ঘটে। উমাইয়া শাসনামলের সর্বশেষ মহামারী ছিল ১৩১ হিজরীর 'ত্বাঊনু মুসলিম বিন কুতাইবা'। এ মহামারীতে সবার আগে মৃত্যুবরণ করেন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি মুসলিম ইবনু কুতাইবা। তাঁর নামেই এই মহামারীর নামকরণ করা হয়। বছরায় আপতিত হওয়া এই মহামারীর স্থায়িত্ব ছিল তিন মাস। এটি শাওয়াল মাসে শুরু হয়ে রামাযান মাসে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তখন একইদিনে এক হাযারের অধিক লোকের জানাযা পড়া হ'ত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আইয়ুব সাখতিয়ানীও এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৯]

শিক্ষা :

১. মহামারী আল্লাহ্র গযব। সেজন্য তা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

২. মহামারী মানুষের আমল সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। তাই নিজেদের আমল সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।[৪০]

৩. মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত সতর্ক থাকতে হবে। যেমন ছাহাবী ওমর (রাঃ), আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) সহ অন্যান্যরা সচেতন ছিলেন। বর্তমানে মাস্ক, প্রতিরক্ষামূলক পোষাক পরিধান, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই কিংবা এসকল পদক্ষেপ আল্লাহর প্রতি ভরসারও বিপরীত নয়।

৪. মহামারীতে আক্রান্ত হ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ বিপদে ধৈর্যধারণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও এতে তারা ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। ধৈর্যশীল মুমিন মহামারীতে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে।

৫. মহামারীতে আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করা যাবে না এবং মহামারী আক্রান্ত এলাকায় গমন করা যাবে না।

৬. মহামারীর সময় আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার রবের প্রতি বিনয়ী হয়ে ও আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াও।[৪১]

৭. মহামারীর কারণে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লে রাষ্ট্র ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনভাবে খলীফা ওমর (রাঃ) করতে চেয়েছিলেন। মহামারী পরবর্তী অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য প্রতিটি কৃষি জমি চাষের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনভাবে ওমর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৮. সর্বোপরি দাম্ভিকতা ও অহংকারপূর্ণ কথা ও কাজ পরিহার করে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করতে হবে।

উপসংহার : যুগে যুগে মহামারীর আগমন ঘটেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মানুষ ও প্রাণী। বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ফলে শাসকেরা অনেক সময় শহুরে জীবন পরিত্যাগ করে মরুভূমির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। এতেও শেষ রক্ষা হয়নি।[৪২] বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণযুগেও করোনা মহামারী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমল সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা ও তওবা করে মহান স্রষ্টার পানে ফিরে আসার বিকল্প কিছু নেই। কারণ আজ সারা বিশ্বের সকল পরাশক্তি একটি অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে অসহায়। সভ্যতাগর্বীদের সকল অহংকার ও দাম্ভিকতা আজ ধূলায় মিশে গেছে। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার যেন আজ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে হার মেনেছে সকলে। অতএব আর অহংকার নয়। দুর্বলের উপর সবলের যুলুম-নির্যাতন নয়। শোষণ-বঞ্চনা নয়। আত্ম সংশোধনের এটিই উপযুক্ত সময়।[৪৩] আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজেদের আমল সংশোধন ও তওবা-ইস্তিগফার করার তাওফীক দান করুন- আমীন ॥

---

৩৬. আল বিদায়াহ ৯/৩০৯; বাযলুল মাঊন ফি ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬৩।
৩৭. আল-বিদায়াহ ৯/৩১২।
৩৮. ইবনু কুতায়বা, আল-মা'আরেফ ১/১৩৫।
৩৯. শরহ মুসলিম ১/১০৬; আল-মা'আরেফ ১/১৩৫; বাযলুল মাঊন ফি ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬৩।
৪০. ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯।
৪১. শারহু মা'আনিল আছার হা/৬৫৬৪; ছহীহাহ হা/২৮৭৭।
৪২. বাযলুল মাঊন ফি ফাযলিত ত্বাঊন ১/৩৬৪।
৪৩. ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৩।

পলাশী ট্রাজেডি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু বাস্তবতা

*ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**

পলাশী বাংলার ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষাদময় ঘটনার সাক্ষী। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীতে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, তার মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। বিপন্ন হয় রাষ্ট্রীয় সত্তা। কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক, সুযোগসন্ধানী, লোভী আর হিংসুক মানুষরূপী ইবলীসদের ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয় চরম বিপর্যস্ত অবস্থা। শস্য-শ্যামল, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জনপদের এ ধরনের পরাজয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে শঠতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও বিভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আর তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল হিন্দু শেঠ বেনিয়ারা, যাদেরকে বিশ্বাস করে মুসলিম শাসকরা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও প্রধান সেনাপতি হবার কারণে ঘটনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল অপদার্থ মীর জাফর, কিন্তু পেছনের প্রধান চক্রান্তকারীরা ছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

যুবক নবাব সিরাজুদ্দৌলা মাত্র পনের মাস বাংলার সিংহাসনে ছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন দেশপ্রেমিক অনন্যসাধারণ শাসক। তিনি যে একজন সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। যে বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতার সাথে তিনি একযোগে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের পাশাপাশি বিদেশী বেনিয়াদের চক্রান্ত উপলব্ধি করে তাদের শায়েস্তা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাতে তাঁর সামরিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হ'ল, তিনি সফল হ'তে পারেননি। কিংবা বলা যায়, তাঁকে সফল হ'তে দেয়া হয়নি। যোগ্য ও পরিণামদর্শী শাসক থাকা সত্ত্বেও সম্পদশালী, সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বাধীন জনপদ কেন এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির শিকার হ'ল তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার সফল না হওয়া এবং দেশী-বিদেশী বেনিয়াদের হাতে দেশের স্বাধীনতা চলে যাওয়ার যে কারণগুলো মূল ভূমিকা রেখেছে, বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, তা গৌণভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মতলবী ও ফরমায়েশী ইতিহাস লিখে যে একটা সময় পর্যন্ত হ'লেও সত্যকে আড়াল করে রাখা যায়, পলাশীর ঘটনা তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। ষড়যন্ত্রমূলক পরাজয় এবং নির্মম শাহাদতের পর ক্ষমতাসীনরা নবাবের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক ইতিহাস ছড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। একটা তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও জুটে যায় একাজে। এমনকি মুসলিম লেখক দিয়েও এ ঘৃণ্য অপকর্ম আঞ্জাম দেয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের এটাই শিক্ষা যে, এক সময় সত্য উদ্ঘাটিত হবেই।

মূলতঃ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশটাই হয়ে উঠেছিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, নবাব আলীবর্দী খাঁ এবং সিরাজুদ্দৌলার শাসনামলে অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদার ছিল হিন্দু। নবাবদের সরলতা এবং উদার চেতনার সুযোগ গ্রহণ করেছিল একটি কুচক্রী মহল। তৎকালীন প্রশাসন ব্যবস্থার 'দেওয়ান' 'তানদেওয়ান' 'সাবদেওয়ান' 'বখশী' প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিতেই হিন্দুরা অধিষ্ঠিত ছিল। এদের মধ্যে একমাত্র মুসলিম ছিল প্রধান সেনাপতি মীর জাফর। অপরদিকে ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই ছিল হিন্দু। ফলে একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবে সিরাজ যখন ইংরেজদের হুঁশিয়ার করে দেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে ও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তারা যদি ব্যবসা করে তবে তাদের সহযোগিতা করা হবে। অন্যথায় তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা ছাড়া কোন পথ থাকবে না, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত তো করেইনি, বরং নানা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করেছিল। এর কারণ তারা ভিতর থেকেই ইন্ধন পাচ্ছিল। এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল নবাবের সুবিধাবাদী ও দেশদ্রোহী কিছু রাজকর্মচারী এবং ঈর্ষাপরায়ণ কিছু নিকটাত্মীয়। ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল আর বাংলার বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী আমাত্যবর্গের মধ্যে ১লা মে ১৭৫৭ সালে এক গোপন লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। অথচ পলাশী বিপর্যয়ের জন্য নবাবের নিকটাত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে এককভাবে দায়ী করা হয়।

মীরজাফর লোভী, অপদার্থ, বিশ্বাসঘাতক ছিল এবং তার চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার ফলেই পলাশী দিবসের প্রহসন মঞ্চস্থ হয়েছিল, সবই ঠিক আছে। কিন্তু উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী শীর্ষ জমিদার-আমলারা যেমন উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্ররায়, নন্দকুমার এরা কি শুধুই পার্শ্বচরিত্র ছিল? একশ্রেণীর ঐতিহাসিক সে রকম ধারণা দিতেই বদ্ধপরিকর। ড. মোহর আলী এক্ষেত্রে যথার্থই বলেছেন, 'মীরজাফর যদি এই চক্রান্তে যোগ নাও দিত, ষড়যন্ত্রকারীরা অন্য কাউকে খুঁজে নিত'।

এদের কূটকৌশল আর পরবর্তী কালের মতলবী প্রচারণা এতই শক্তিশালী ছিল যে, আজকে আমজনতার একটা বিরাট অংশ মিথ্যাচারকে প্রকৃত ইতিহাস বলে গ্রহণ করে ফেলেছে। বিশাল সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্র-শস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ২৩শে জুন ১৭৫৭ পলাশী প্রান্তরে যুদ্ধ যুদ্ধ নাটকের মাধ্যমে জাতীয় বেঈমানরা দেশ ও জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিদেশী বেনিয়ার কাছে বিক্রি করে দেয়। পরিকল্পনা মাফিক নবাবকে তারা গ্রেফতার ও পরে শহীদ করে।

পলাশীর এই যে সুদূর প্রসারী বিপর্যয়, এর সঠিক ইতিহাসটিও সাধারণকে জানতে দিতে চায়নি ইংরেজ ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট নব্য ভদ্রলোক বর্ণহিন্দু প্রভাবিত ঐতিহাসিকরা। নবাব সিরাজের পতনের পরপরই ফিরিঙ্গিরা কতক উচ্ছিষ্টভোগীকে দিয়ে ইতিহাস রচনা করায়। যেগুলোর মাধ্যমে সিরাজের চরিত্র হনন করা হয় নির্লজ্জভাবে। সিরাজের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়ে তারা বলতে চায় যে, তিনি ছিলেন অযোগ্য, চরিত্রহীন, লম্পট, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ইত্যাদি। তাঁর নিষ্ঠুরতার

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বায়বীয় বর্ণনা দিতে গিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক ডডওয়েল লিখেছেন, 'সিরাজ এতটাই নিষ্ঠুর ছিলেন যে, সে কৌতুহল বশে গর্ভবতী মহিলার পেট চিরে দেখত ভেতরে কি আছে! শুধু তাই নয়, একথা পর্যন্ত তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, নবাবের পতন হয়েছে নিজেদের কোন্দলে। ইংরেজরা বরং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করেছে।

ইংরেজদের কৃপাধন্য হিন্দু ঐতিহাসিক রাজীব লোচন লিখেছেন 'যবন রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্যই হিন্দু আমাত্য-জমিদাররা উদ্যোগী হয়েছিলেন'। বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, পলাশীর এই যুদ্ধকে কোন কোন হিন্দু লেখক 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে দেবতা হ'লেন ক্লাইভ আর 'অসুর' ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে শহীদ নবাব সিরাজ। শুধু এখানেই থেমে থাকেনি বর্ণবাদী হিন্দুরা। তারা পলাশীর শোকাবহ বিপর্যয়কে উপজীব্য করে বিজয় উৎসব পালনের লক্ষ্যে বাংলায় শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করে লর্ড ক্লাইভকে দেবতাতুল্য সংবর্ধনা দেয় ১৭৫৭ সালে। ইতিপূর্বে বসন্তকালে এ দুর্গোৎসব পালন করা হ'ত।

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, শিক্ষা-সভ্যতায় আলোকিত, সত্যিকার উদার চেতনাসমৃদ্ধ একটি সুখী জনপদ যে কীভাবে লুটপাট, অধিকার হরণ আর দুর্নীতির ফলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে চরম বিপর্যয়কর অবস্থায় পতিত হ'তে পারে, পলাশী পরবর্তী বাংলার ইতিহাস না পড়লে সেটা জানা কঠিন হবে। এতবড় বিপর্যয় ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

পলাশী বিপর্যয়ের পর বাংলা ইংরেজ ও তাদের দেশীয় দালাল বর্ণহিন্দুদের লুটপাটের স্বর্গভূমি হয়ে উঠেছিল। পেটের দায়ে এদেশে আসা ইংরেজ ও তাদের দেশীয় সেবাদাস জগৎশেঠ গংরা রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যায়। ইংরেজরা এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুর্নীতি আমদানী করে ব্যাপকভাবে। ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত মাত্র দশবছরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ৬০ লাখ পাউণ্ড আত্মসাৎ করেছিল। বর্তমানে ১ পাউণ্ড সমান বাংলাদেশী ১০৪.৭১ টাকা। এই ব্যাপক লুণ্ঠনের ফলে ১৭৭০ সালে (বাংলা-১১৭৬) বাংলা ও বিহারে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্রায় দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত এই মহাদুর্ভিক্ষে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর স্বীকারোক্তি মোতাবেক মৃতের সংখ্যা ছিল এক কোটি পঞ্চাশ লাখ! শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পলাশী পরবর্তীকালে ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য দেখা দেয়।

ঐতিহাসিক ম্যাক্সমুলার উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজদের ক্ষমতা দখল কালে বাংলায় আশি হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতি চারশ লোকের জন্য তখন একটি মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসাগুলিতে হিন্দু-মুসলিম সকল শিক্ষার্থী একই সাথে পড়াশোনা করত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এদেশে মিলেমিশে থাকত ও সমঅধিকার ভোগ করত। সেই শান্তিপূর্ণ সমাজে চরম সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা। মাদ্রাসাগুলির অধিকাংশ ইংরেজ আমলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পলাশী পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের দ্বারা বাংলা ভাষার ধারাবাহিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্র আর প্রসাদপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ রূপ ও সাহিত্যের গতি পাল্টে গেল। ফলে বাংলা ভাষা হয়ে উঠলো বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখারই নামান্তর।

তখনকার উক্ত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির চেয়ে বর্তমানে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল, ইতিহাসের এই অন্ধকার দিকটিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করার একটা আত্মঘাতী প্রবণতা। এরা কেন কী অথবা কাদের স্বার্থে জাতির অতীত ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছেন তা নতুন প্রজন্মকে বুঝতে হবে। প্রগতিশীল দাবীদার একশ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করলেও বাঙালীরা তাদের স্বাধীনতা হারায়নি। কারণ সিরাজুদ্দৌলা ও তাঁর আগের শাসকরা বহিরাগত এবং অবাঙালী! পলাশী সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। মুর্শিদাবাদ দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বই নাকি ইংরেজদের অনিবার্যভাবে বাংলার রাজনীতিতে টেনে এনেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি!। এসব হ'ল মতলবী প্রচারণা ও অলীক কল্পকাহিনী। আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচারণা যে কত মারাত্মক হ'তে পারে, তা পলাশী পরবর্তী বিকৃত ইতিহাসের ছড়াছড়ি থেকে প্রমাণিত। আজও নব্য আধিপত্যবাদী ও তাদের দোসরদের একই প্রকার অপপ্রচার দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়।

ইলিয়াস শাহী সালতানাতের পতনে রাজা গণেশ, পলাশীর যুদ্ধে জগৎশেঠ-রাজবল্লভদের ভূমিকা অনেক কিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমাদেরকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পলাশী দিবসের শিক্ষা আমাদের জাতিসত্তার বিকাশে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে। পলাশী হ'ল সেই আয়না, যা দিয়ে সেদিনের ও আজকের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, বহিঃশক্তির দালালদের সহজেই চেনা সম্ভব। সুতরাং এ দিবসের প্রকৃত শিক্ষা ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে উদ্যোগী হ'তে হবে আমাদেরকে। সাথে সাথে এদেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা হিসাবে নবাব সিরাজের আদর্শকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সম্প্রদায়িক ইঙ্গ-হিন্দু লিখিত পলাশীর বিকৃত ইতিহাসকে সরিয়ে সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে তা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। আর একটি পলাশী থেকে রক্ষা পেতে জেগে উঠতে হবে এখনই। নব্য মীরজাফর-জগৎশেঠদের চিহ্নিত করতে হবে। যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশ ও জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে তৎপর, যারা দেশের সার্বভৌমত্বকে অবমাননা করে ভিনদেশীদের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত, যারা নিজ দেশের সম্পদকে অপরের হাতে তুলে দিতে মরিয়া, এদের ব্যাপারে সজাগ হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নইলে পলাশী বিপর্যয়ের চেয়েও ভয়াবহ বিপর্যয় এ জনপদকে গ্রাস করবে।

রবার্ট ক্লাইভ : ইতিহাসের এক ঘৃণ্য খলনায়ক

*ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান**

রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪ খ্রি.) ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সংঘটিত পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজ সেনাপতি। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্থপতি। আয়ারল্যান্ডের একটি মাঝারি জমিদার পরিবারের সন্তান রবার্ট ক্লাইভ মাত্র আঠারো বছর বয়সে প্রথমে মাদ্রাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে যোগ দেন। পরে ১৭৪৮ সালে কোম্পানীর মাদ্রাজ সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগদান করেন এবং দ্রুতই একজন দক্ষ সমরকর্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। কর্ণাটক যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁর অব্যাহত সামরিক সাফল্য তাঁকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসে। ১৭৫৩ সাল তিনি দেশে ফিরে গেলে তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স তাঁকে জেনারেল ক্লাইভ' উপাধিসহ একটি রত্নখচিত তরবারি উপহার দিয়ে সম্মানিত করে।

১৭৫৬ সালে নবাব আলিবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজ ছিলেন বয়সে (২৩ বছরের) তরুণ এবং একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি নিজেকে চারদিক থেকেই শত্রু পরিবেষ্টিত দেখতে পান। তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে অন্যতম ও প্রভাবশালী ছিল ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। সমকালীন ব্রিটিশ ও ভারতীয় এমনকি, আধুনিককালেও ঐতিহাসিকদের অনেকেই ইংরেজদের সাথে বিরোধ ও সংঘর্ষের জন্য সিরাজকেই দায়ী করেছেন। কারো কারো মতে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন এবং এদেশ থেকে ইংরেজদের বহিষ্কার করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কেউ কেউ মনে করেন, সিরাজুদ্দৌলার আত্মম্ভরিতা ও অর্থলিপ্সাই ইংরেজদের সাথে তাঁর সংঘর্ষের মুখ্য কারণ। এসব অভিযোগের কোনটিই যে সত্য নয়, সমসাময়িক ইংরেজ, ফরাসী এবং ডাচ কোম্পানীর দলীল-দস্তাবেজ বিচার-বিশ্লেষণ করে বর্তমান ইতিহাসবিদদের অনেকের গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। মসনদে আরোহণের পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা যদি শান্তিপূর্ণভাবে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে তিনি তাদের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা দেবেন। অন্যথায় তাদের এদেশ থেকে বহিষ্কার করাই হবে তাঁর একমাত্র নীতি। একজন সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে নবাবের এ ধরনের অবস্থান নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ও প্রশংসনীয়। তবে কোম্পানী নবাবের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, বরং তার বাণিজ্য পরিচালনা আইনের সীমালংঘনসহ নিজস্ব নিরাপত্তার নামে তারা নবাবী কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষা- উপহাস এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও প্রশাসনে হস্তক্ষেপের মতো গর্হিত কাজ অব্যাহত রাখে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নবাব ইংরেজদের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কূটনৈতিক প্রয়াস চালান। তবে কোম্পানীর কলকাতার গভর্নর ড্রেকের অনমনীয় ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে তা ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে ইংরেজদের কাশিমবাজার দুর্গ দখল করা হয়। এরপর নবাবী ফৌজ ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন কলকাতার ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ১৭৫৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ আবার মাদ্রাজে ফিরে আসেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক ইংরেজদের কলকাতা কুঠি দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ কলকাতার দুর্গ পুনর্দখল ও বিপদগ্রস্ত ইংরেজদের উদ্ধারের জন্য রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে নৌপথে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।

এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী নৌবাহিনী ক্লাইভের সাথে যোগ দেয় এবং তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে। কলকাতায় নিযুক্ত নবাবের ফৌজদার মানিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্লাইভ সহজেই কলকাতা দখলে সফল হন। কলকাতা পুনরুদ্ধারের ঘটনা মানিকচাঁদ যথাসময়ে নবাবকে অবহিত করেননি। ১৭৫৭ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ সংবাদ পেয়ে নবাব হতবাক হয়ে যান। এ অবস্থায় নবাব ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দানের লক্ষ্যে কলকাতা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেও কুচক্রী জগৎশেঠ, মীরজাফর, খাজা ওয়াজিদ, রায়দুর্লভ প্রমুখ দরবারের প্রধান অভিজাতদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ইংরেজদের সাথে সমঝোতা করেন। ফল হিসাবে ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর সাথে নবাবের অবমাননাকর আলিনগরের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

কলকাতা পুনর্দখল ও নিজেদের স্বার্থানুকূল আলিনগর সন্ধি সম্পাদনে সাফল্য রবার্ট ক্লাইভের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। তাঁর সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে কোম্পানীর মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে কলকাতায় কোম্পানীর গভর্নর নিয়োগ করেন। উচ্চাভিলাষী ও ধূর্ত ক্লাইভ এবার বাংলা থেকে তাঁদের প্রতিপক্ষ ফরাসী বণিক কোম্পানীকে বিতাড়িত করেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা এতে বাধা দেয়ায় নবাবের সাথেও তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। ক্লাইভ বুঝেছিলেন যে, বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে প্রধান বাধা নবাব সিরাজুদ্দৌলা। তাই তিনি তাঁকে অপসারণ করে নিজেদের স্বার্থানুকূল একজনকে বাংলার মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। এব্যাপারে তিনি কোম্পানীর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেন। ক্লাইভ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোম্পানীর বিদ্যমান সামরিক শক্তি দিয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বাঁকা পথে অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদ দরবার

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও রাজনীতিতে জগৎশেঠ ও মীরজাফর গং এর নেতৃত্বে সিরাজ বিরোধী যে ষড়যন্ত্রী দলের উদ্ভব হয়েছিল, চতুর ক্লাইভ প্রলোভন ও কুটকৌশলে তাঁদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন। এ আঁতাতের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ নামক এক প্রহসনের। এ যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হন এবং পরবর্তীকালে মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্তৃক বন্দী ও ৩রা জুলাই নিহত হন। মীরজাফরকে সিরাজুদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মীরজাফর পুতুল নবাব হিসাবে ইতিহাসে 'ক্লাইভের গাধা' উপাধিতে পরিচিতি লাভ করেন।

রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সকে লেখা পত্রে ফরাসীদের বিতাড়িত করা ও পলাশী যুদ্ধে বিজয়কে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এ বক্তব্য অবশ্যই সঠিক। কারণ মাদ্রাজে ধারাবাহিক বিজয় তাকে খ্যাতিমান করেছিল, কিন্তু সম্পদশালী করেনি। কিন্তু বাংলায় তিনি খ্যাতির সঙ্গে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ লাভ করেন। একই সাথে তিনি ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সূচনাকারীর গৌরবও অর্জন করেন। ১৭৬০ সালে অবসর গ্রহণ করে ক্লাইভ দেশে ফিরে যান। ১৭৬২ সালে তাঁকে Baron Clive of Plessey উপাধি দিয়ে আইরিশ অভিজাতমণ্ডলীতে উন্নীত করা হয়। তা ছাড়াও ১৭৬৪ সালে তাঁকে Knight of the Order of the Bath উপাধি দেয়া হয়। শ্রুসবেরির মেয়র নির্বাচিত হন। ক্লাইভ যদিও গ্রাজুয়েট ছিলেন না, তবু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Doctor of Civil Law ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত করে।

১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন। এ পর্যায়ে তিনি এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে খেতাব সর্বস্ব মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বার্ষিক নিয়মিত ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী নিশ্চিত করেন। সম্রাট তাঁকে 'দিলার জং', 'সাইফ জং', 'আমীরুল মামালিক', 'যুবদাতুল মুল্‌ক' ইত্যাদি এক গুচ্ছ উপাধি দ্বারাও সম্মানিত করেন। এবার ক্লাইভ কেবল পুলিশ ও বেসামরিক শাসনভার নামমাত্র নবাবের হাতে রেখে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ক্লাইভের এই ব্যবস্থাকে ইতিহাসে 'দ্বৈতশাসন' বলা হয়।

১৭৬৭ সালে ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। কিন্তু ভারতে রেখে যান ঘুষ, দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, দুর্বৃত্তায়ন আর অপরাজনীতির এক ঘৃণ্য ইতিহাস। তিনি কিছু দিন প্যারিসেও বাস করেন। তারপর আবার দেশে ফিরে আসেন। এ সময় তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হয়। এদিকে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের করুণ মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় খোদ ইংল্যাণ্ডে হৈ চৈ পড়ে যায়। ক্লাইভ এবং কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতি ও পার্লামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তদন্তে ভারতে ক্লাইভের অপশাসন, দুর্নীতি, লুণ্ঠনের বিস্ময়কর কাহিনী বের হয়ে আসে।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে অর্জিত সব সম্পদের বিনিময়ে তদন্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ক্লাইভ। অবশেষে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর লণ্ডনের ব্রাকলি স্কয়ারের নিজ বাড়িতে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। তিনি কোনও সুইসাইড নোট লিখে না যাওয়ায় তাঁর আত্মহত্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। (অনেকের মতে তিনি ৭ বছর কারাভোগের পর বেরিয়ে এসে টেম্‌স নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন)। ইতিহাসবিদ স্যামুয়েল জনসন লিখেছেন, (ক্লাইভ) এমন সব অপরাধের মাধ্যমে তাঁর ভাগ্য গড়ে তুলেছিলেন, যেগুলো সম্পর্কে তাঁর চৈতন্য শেষমেশ তাঁকে নিজের গলা কাটতে বাধ্য করেছিল। তাঁর আত্মহত্যা সম্পর্কে এটিই বহুল প্রচারিত মত। তাঁকে রাতের অন্ধকারে গোপনে সমাহিত করা হয়েছিল এবং তাঁর কবরে পরিচিতিমূলক কোনও ফলক বা চিহ্নও রাখা হয়নি।

রবার্ট ক্লাইভ ইতিহাসে এক চরম বিতর্কিত চরিত্র। উপমহাদেশের মানুষের কাছে তিনি এক বিয়োগান্ত কাহিনীর প্রণেতা, এক মূর্তিমান শয়তান। অন্যদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবে এক সময় স্বদেশবাসীর কাছে তিনি বীর হিসাবে সম্মান লাভ করেছিলেন। স্যাক্সন যুগে স্থাপিত ইংল্যান্ডের ছোট্ট শহর শ্রুসবেরি ও ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র হোয়াইট হলের সামনে স্থাপন করা হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের দু'টি ভাস্কর্য। কিন্তু ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভ শেষ পর্যন্ত নিজ দেশেই আসামির কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। উপমহাদেশের মানুষ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তাশীল মানবতাবাদীদের কাছে তিনি বরাবরই একজন খলনায়ক। সময়ের আবর্তে তিনি নিজ দেশেও উপনিবেশবাদের মূর্ত প্রতীক ও চরমভাবে ঘৃণ্য। ক্লাইভ উপমহাদেশের মানুষের জন্য অত্যাচারের প্রতীক। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড হত্যার পর বিশ্বে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের যে উত্তাল তরঙ্গ শুরু হয়েছে, ইংল্যাণ্ডে এর প্লাবন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই রবার্ট ক্লাইভের মূর্তি অপসারণের দাবী উঠেছে। আওয়াজ উঠেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীটিও প্রত্যাহারের। এ দাবী জানানোদের মধ্যে যেমন আছেন সাধারণ মানুষ, তেমনি ব্রিটেনের অনেক বিখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ। বিখ্যাত 'হোয়াইট মুঘলস' এবং 'দ্য অ্যানার্কি: দ্য রিলেন্টলেস রাইজ অব দ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গ্রন্থের লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পলও এদের একজন। দ্যা গার্ডিয়ান পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে কীভাবে ক্লাইভের মতো লোকের মূর্তি এখনো আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্লাইভ এমন কোন ব্যক্তি নন, যাকে আমাদের এই যুগে সম্মান জানানো উচিৎ।--- এখন সময় এসেছে এই মূর্তিটিও

জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়ার।--- কেবল এই কাজ করার মাধ্যমেই আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের অতীত কৃতকর্মের মুখোমুখি হ'তে পারব এবং যতকিছুর জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া দরকার, সেই ক্ষমা চাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারব। তারপরই এই সাম্রাজ্যবাদী অতীতের ভারী বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সামনে আগাতে পারব।

ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। তবে ইতিহাস কাউকে ক্ষমাও করে না। পলাশী নামক প্রহসনের যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় ও তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর, তাঁকে ইতিহাসে খলনায়ক হিসাবে চিত্রিত করার দেশী-বিদেশী অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও চলছে। তবে ঐতিহাসিক সত্যকে কখনও চাপা দিয়ে রাখা যায় না। সময়ের পরিক্রমায় ইতিহাসে সত্য উদ্ভাসিত হয়। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। তাই পলাশীর প্রায় পৌনে তিনশ' বছর পর নবাব সিরাজুদ্দৌলা আজও ইতিহাসের মহানায়ক হিসাবে স্বমহিমায় ভাস্বর। অন্যদিক রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁর এদেশীয় দোসর মীর জাফর ও জগৎশেঠ গং ইতিহাসের ঘৃণ্য খলনায়ক। এটিই ইতিহাসের শিক্ষা। *[সংকলিত]*

পলাশীর ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম

(১) মীরজাফর : ৮০ বছর বয়সে তাকে নবাব করা হয়। তাকে 'ক্লাইভের গাধা' বলা হ'ত। দুর্নীতির দায়ে ২ বছর পর বহিষ্কার করা হয় এবং তার জামাতা মীর কাশিমকে নবাব করা হয়। ২ বছর পর মীর কাশিমকে সরিয়ে মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করা হয়। ২ বছর পর আবার হটানো হয় এবং ইংরেজরা সরাসরি ক্ষমতায় বসে। মীরজাফর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। তখন পরিবারের লোকেরা তাকে জঙ্গলে ফেলে আসে। রাজা নন্দকুমার তাকে কিরিটেশ্বরী দেবীর পা ধোয়া পানি খাওয়ায়। আর এভাবেই সবশেষে ঈমানটুকুও হারিয়ে সে প্রাণত্যাগ করে।

(২) মীরণ : ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক মীরজাফর পুত্র মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যায় অথবা জনৈক ইংরেজ সেনাপতির গুলিতে সে নিহত হয়।

(৩) ঘসেটি বেগম : সিরাজুদ্দৌলার আপন খালা ঘসেটি বেগম। সিরাজের উচ্চ মর্যাদায় তিনি ঈর্ষাকাতর ছিলেন এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মীরণ তার ফুফু ঘসেটি বেগমকে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করে।

(৪) মোহাম্মদী বেগ : রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এই বেওয়ারিশ বাচ্চাকে সিরাজের পিতা-মাতা পুত্র স্নেহে লালন-পালন করেন। মাত্র ১০ হাযার টাকার লোভে সে ১৭৫৭ সালের ২রা জুলাই মীরণের হুকুমে মুর্শিদাবাদ কারাগারে ঢুকে তার মনিব সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করে। পরে সে পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পানিতে পড়ে ডুবে মরে।

(৫) মীর কাশিম : আপন ফুফাতো ভগ্নিপতি ও মীরজাফরের জামাতা এই ব্যক্তি ভগবানগোলা থেকে সিরাজুদ্দৌলাকে সরিয়ে দেয়। মীরজাফরের পরে সে নবাব হয়। ২ বছর পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। পরে সে পথে পথে ঘুরতে থাকে। একদিন সকালে তার লাশ মুঙ্গের দুর্গের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

(৬) রায়দুর্লভ জগৎশেঠ : এদেরকে মীর কাশিম গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যা করে। **রাজা রাজবল্লভকে** গলায় বালুর বস্তা বেঁধে গঙ্গা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। **ইয়ার লতিফ খাঁ** নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। **উমিচাঁদ** প্রতিশ্রুত ২০ লাখ টাকা না পেয়ে পাগল হয়ে যায়। অবশেষে সে কুষ্ঠরোগে মারা যায়।

(৭) ক্লাইভ : মাত্র ৮০ টাকা বার্ষিক বেতনে ১৭৪৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে মাদ্রাজে আসা এই ব্যক্তি ১৭৬০ সালে যখন দেশে ফেরেন, তখন তার ছিল নগদ ২ কোটি টাকা সহ স্ত্রীর বিরাট গহনার বাক্স। যাতে ছিল মণি-মুক্তা সহ বহু মূল্যবান অলংকারাদি। পরে স্ত্রী তাকে ছেড়ে অন্য যুবকের সাথে চলে যায়। বাংলা লুণ্ঠনের দায়ে ১৭৬৭ থেকে ৭ বছর জেল খেটে কপর্দক শূন্য অবস্থায় ১৭৭৪ সালে বের হন। অতঃপর নিজ বাড়ীতে মতান্তরে লণ্ডনের টেম্‌স নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন মাত্র ৪৯ বছর বয়সে। অথচ তার হাতেই বাংলার সাড়ে ৫শ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয় এবং সারা ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়।

শিক্ষণীয় :

(১) নেতৃত্বের সরলতা অনেক সময় জাতীয় দুর্যোগ ডেকে আনে। যেমন নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁর আপন ভগ্নিপতি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতি করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, তিনি তরুণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার মুরব্বী হবেন ও তাকে সার্বিক সুরক্ষা দিবেন। যেভাবে জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি বৈরম খাঁ তরুণ সম্রাট আকবরকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু হয়েছিল তার বিপরীত।

একইভাবে প্রশাসনের প্রধান ৭টি পদের ৬টি পদেই তিনি হিন্দুদের বসিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এর ফলে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু হয়েছিল তার বিপরীত। মূল পদগুলি নিজেদের হাতে না রেখে অতি উদারতা দেখিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ উপক্ষো করেছিলেন *(মায়েদাহ ৫/৫৭)*। যার ফল ভোগ করেছেন সিরাজুদ্দৌলা এবং সাথে সাথে বাংলার মানুষ। অতএব সর্বদা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হ'তে হবে এবং কোন অবস্থাতেই আত্মবিস্মৃত হওয়া যাবে না।

(২) ইসলামের মূলনীতির উপর সর্বদা দৃঢ় থাকতে হবে এবং অমুসলিম নেতাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

(৩) অর্থনৈতিক স্বার্থ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। অতএব মাল ও মর্যাদালোভী ব্যক্তিদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

(৪) পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের ৩৫০০ সৈন্যের কাছে নবাবের ৫০,০০০ সৈন্যকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। যার মূল কারণ ছিল জাতির মধ্যে অনৈক্য এবং ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। সেকারণ পলাশীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থে যেকোন মূল্যে সর্বদা সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে *(স.স.)*।

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

(২য় কিস্তি)

মসজিদের ফযীলত :

ইসলামী শরী'আতে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্বছা, চতুর্থ মসজিদে কোবা। মর্যাদাপূর্ণ এ চারটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। উল্লিখিত প্রত্যেক মসজিদের পৃথক পৃথক ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. মসজিদে হারামের ফযীলত :

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হ'ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা : মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، 'অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা'বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো'আ করেন, ছালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা'বার সামনে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা'।[১]

(২) কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক : কা'বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَن صَلَّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِه، 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার'।[২]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব : বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي ألْفُ صلاةٍ،

'মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ বেশী'।[৩]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، ومَسْجِدِ الأقْصى. 'মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)'।[৪]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে : ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إنَّ الإسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها. 'ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে'।[৫]

(৬) এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না : আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى

'যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে

** সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *বুখারী হা/৩৯৮; মুসলিম হা/১৩৩০; নাসাঈ হা/২৯১৭।*

২. *বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/১৩।*

৩. *'আল জামি'উছ ছাগীর হা/৫৮৫, ছহীহুল জামি' হা/৪২১১।*

৪. *বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাউদ হা/২০৩৩।*

৫. *মুসলিম হা/১৪৬, (ই.ফা) হা/২৭১।*

বসবে (এটা কা'বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা'বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম'।[৬]

'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও? সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন'।[৭]

(৭) ইসরা ও মি'রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের অন্যতম মু'জিযা মি'রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আল-ইসরা ১৭/১)*।

(৮) মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ : বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا– 'হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে' *(তাওবা ৯/২৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহ্র ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না। হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না'।[৮]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না : দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إِلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إِلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إِلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন'।[৯]

(১০) এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ : পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথ ও মাসজিদুল হারাম হ'তে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' *(হজ্জ ২২/২৫)*।

খ. মসজিদে নববীর ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত, মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীরও। বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই মসজিদ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে 'হারামাইন' বলা হয়। যেমন-

(১) মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ উত্তম : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

৬. *বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪।*
৭. *মুসলিম হা/২৬২; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৭০।*
৮. *বুখারী হা/৪৬৫৫; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূ দাঊদ হা/১৯৪৬।*
৯. *বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।*

রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ‘মসজিদুল হারাম (কা‘বা) ব্যতীত আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণ বেশী ছওয়াব’।[১০]

(২) এই মসজিদের একটি স্থান হ’ল জান্নাতের বাগান : আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ মাযিনী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ‘আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান’।[১১] অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজ (কাউছার) এর উপরে।[১২]

(৩) বায়তুল্লাহর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও ছওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা বৈধ।[১৩]

(৪) এই মসজিদ তথা মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।[১৪]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে নববীর দিকে।[১৫]

গ. মসজিদে আক্বছার ফযীলত :

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হ’ল মসজিদে আক্বছা। ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ বা ‘বায়তুল মাক্বদিস’ ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) চল্লিশ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা : ছালাত ফরয হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। বারা ইবনু ‘আযিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ‘আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)* নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবৎ বায়তুল মুক্বাদ্দিসের দিকে মুখ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি।[১৬]

(২) ইসরার শেষ স্থান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ তা‘আলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ *(ইসরা ১৭/১)*। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই মসজিদের আশপাশ আল্লাহ বরকতময় করে রেখেছেন। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আর এই কারণে একে বরকতময় বলা হয়েছে।

(৩) মি‘রাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এই মসজিদ থেকেই মি‘রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

(৪) ছওয়াবের আশায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ।[১৭]

(৫) পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ : মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ হ’ল মসজিদে আক্বছা।[১৮]

(৬) সকল নবীদের একত্রিত হওয়ার স্থান : নবী-রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আবাসস্থল ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশেপাশের এলাকা। এছাড়াও মি‘রাজের সময় নবীগণকে আল্লাহ তা‘আলা এই মসজিদে একত্রিত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইমামতিতে সকলে ছালাত আদায় করেছিলেন।[১৯] এ কারণেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

(৭) এই মসজিদে ছালাত আদায় জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফের মাধ্যম : আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হ’ল- আল্লাহ্র হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু’টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে’।[২০]

ঘ. মসজিদে ক্বোবার ফযীলত :

মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশের আগে ক্বোবা নামক স্থানে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করেন ও একটি মসজিদ তৈরী করেন। তারপর সেখানে ছালাত আদায় করেন। এটাই ক্বোবা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে ১

---

১০. *বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; আহমাদ হা/১৬০৫।*
১১. *বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; আহমাদ হা/৮৮৭২।*
১২. *বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; আহমাদ হা/৭২২২।*
১৩. *বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩।*
১৪. *বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।*
১৫. *মুসলিম (হা.একা.) হা/২৪৮ (ই.ফা) হা/২৭১।*
১৬. *মুসলিম হা/৫২৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান’ অধ্যায় ।*
১৭. *বুখারী হা/১১৮৯; আবূদাউদ হা/২০৩৩।*
১৮. *বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩।*
১৯. *মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮।*

ফারসাখ তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এটিই ছিল মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল (ছাঃ)-কে এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন। তারপর প্রথমে রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) একটি রাখেন। এরপর বাকী কাজ 'আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।[২১] মসজিদে ক্বোবার অনেক ফযীলত রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছার পূর্বে ক্বোবা নামক স্থানে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম হচ্ছে 'মসজিদে ক্বোবা', যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. 'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে ছালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

(২) ওমরাহ্র সমান নেকী লাভ : বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে ছালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من تطهَّر في بيته، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرةٍ. 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে'।[২২]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রতি শনিবার ক্বোবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সাওয়ারীতে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)ও ঐরূপ করতেন।[২৩] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[২৪]

ঘ. অন্যান্য মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত :

উপরোক্ত চারটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলোরও বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ আল্লাহ্র ঘর : পৃথবীর সকল মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য মসজিদগুলিকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র ঘর' বলা হয়। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কা'বা ঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন যে, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৩৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহ্র ঘরসমূহের কোন এক ঘরে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। এমনকি তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের মধ্যে আলোচনা করেন'।[২৫]

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, المساجدُ بيوتُ اللهِ في الأرضِ تضيءُ لأهلِ السَّماءِ كما تضيءُ نجومُ السَّماءِ لأهلِ الأرضِ 'পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহ্র ঘর। এগুলো আসমানবাসীর জন্য তেমনি আলোকিত করে যেমনভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আকাশের তারকাগুলো আলোকিত করে'।[২৬]

(২) মসজিদের মালিক আল্লাহ : পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপরেও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের' *(কুরায়শ ১০৬/৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই মসজিদ

---

২১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬), ২৩৮-২৩৯ পৃঃ।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১।*
২৩. *বুখারী হা/১১৯৩।*
২৪. *বুখারী হা/১১৯৪।*
২৫. *মুসলিম হা/৭০২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; তিরমিযী হা/২৯৪৫; ছহীহুল জামি' হা/৬৫৭৭।*
২৬. *হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০।*

সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ৭২/১৮)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়?' *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*।

(৩) মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা : পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পসন্দের জায়গা হ'ল মসজিদ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ البلادِ إلى اللهِ مساجدُها وأبغَضُ البلادِ إلى اللهِ أسواقُها 'আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হ'ল মসজিদ সমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হ'ল বাযার সমূহ'।[২৭]

(৪) মসজিদ এমন জায়গা যেখানে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় : মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ،

'(উক্ত জ্যোতি থাকে) মসজিদ সমূহে, যেগুলিকে আল্লাহ মর্যাদামণ্ডিত করার এবং সেখানে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতের আদেশ করেছেন। (মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে' *(নূর ২৪/৩৬-৩৭)*।

(৫) ছালাত আদায়ের স্থান : ঈমানের পর বান্দার উপর ফরয হ'ল ছালাত আদায় করা। ক্বিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। মসজিদে নিম্নোক্ত ছালাত আদায় করা হয়।

(ক) জুম'আর ছালাত : সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হ'ল জুম'আর দিন। জুম'আর দিনের প্রধান আমল হ'ল জুম'আর ছালাত আদায় করা। জুম'আর ছালাতের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،

'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আ ৬২/৯)*।

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لينتَهِيَنَّ أقوامٌ عن ودعِهِمُ الجمعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللهُ على قلوبِهِم، وليَكونُنَّ مِنَ الغافلينَ 'লোকেরা যেন জুম'আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে'।[২৮]

(খ) ফরয ছালাত আদায়ের স্থান : ফরয ছালাতের উত্তম স্থান হ'ল মসজিদ। আর নফল ছালাতের উত্তম স্থান হ'ল বাড়ী। আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে গ্রামে বা অঞ্চলে তিনজন মানুষ বসবাস করবে, সে স্থানে জামা'আতে ছালাত আদায় করা না হ'লে তাদের ওপর শয়তান জয়ী হয়। অতএব তুমি জামা'আতকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে'।[২৯]

(গ) আগমনী ছালাতের স্থান : কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. 'নবী করীম (ছাঃ) সফর হ'তে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করতেন'।[৩০]

মসজিদ শুধু ছালাতের স্থান নয়; বরং ছালাতের সাথে সাথে আল্লাহ্র যিকর ও কুরআন তিলওয়াতেরও স্থান। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। ছাহাবীগণ তখন বলে উঠলেন, থাম, থাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাই ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। পেশাব শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহ্র যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলেন সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিল।[৩১]

---

২৭. *মুসলিম হা/৬৭১, ই.ফা. হা/১৪০০; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামি' হা/১৬৭।*

২৮. *মুসলিম হা/৮৬৫; নাসাঈ হা/১৩৭০; ইবনে মাজাহ হা/১১২৭।*

২৯. *আবূ দাঊদ হা/৫৪৭; আহমাদ হা/২৭৫১৪; মিশকাত হা/১০৬৭।*

৩০. *বুখারী হা/৪৪১৮, 'ছালাত' অধ্যায় 'সফর হ'তে ফিরে আসার পর ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৭৬৯।*

৩১. *বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।*

(৬) মসজিদে ছালাত আদায়ে অধিক ছওয়াব : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ على صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلكَ أَنَّهُ: إذا تَوَضَّأَ، فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلّا رُفِعَتْ له بها دَرَجَةٌ، وحُطَّ عنه بها خَطِيئَةٌ، فإذا صَلّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عليه، ما دامَ في مُصَلّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزالُ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاةَ

'ঘরে অথবা বাযারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভাল করে ওযূ করে কেবলমাত্র ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে গমন করে, তার প্রতি ক্বদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন ছালাত আদায় শেষ করে মুছাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তখন ঐ ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দো'আ করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। আর তোমাদের কেউ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করলে, সে সময়টা ছালাতের মধ্যেই গণ্য হবে'।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً 'একা একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব'।[৩৩]

(৭) ই'তেকাফের স্থান : মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই'তেকাফ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন কর না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

(৮) মসজিদ আল্লাহভীরুদের ঘর : আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِيٍّ 'মসজিদ হ'ল প্রত্যেক আল্লাহভীরুদের ঘর'।[৩৪]

[চলবে]

---

৩২. মুসলিম হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।
৩৩. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।
৩৪. ত্বাবারাণী, আল-কাবীর; ছহীহাহ হা/৭১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩০।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা

(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা

(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়'। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বলে এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। কুরবানীর মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে' গৃহীত হবে।[২]

২. যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি'।[৩]

> لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ
>
> 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে কমপক্ষে তিন বার করে ও অন্যান্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে।[৫]

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ওমর, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'।[৬] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৭]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত[৮] উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না'। তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[৯] বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[১০]

৮. মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। 'উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[১১] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন।

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন'[১২] কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই।[১৩]

---

১. *মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।*
২. *আহমাদ হা/৬৫৭৫; হাকেম ৪/২৪৮, হা/৭৫২৯; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩।*
৩. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
৫. *ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫।*
৬. *মির'আত ৫/৭০।*
৭. *যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃ.।*
৮. *মির'আত ৫/৬২।*
৯. *মির'আত হা/১৪৪৭, ১৪৫৪; ৫/৩৭, ৪৫; আহমাদ হা/২৩০৩৪।*
১০. *বায়হাক্বী ৩/২৮৩, হা/৫৯৫৬; সুবুলুস সালাম, তা'লীক্ব আলবানী ২/২০০।*
১১. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১২. *মুসলিম হা/৮৯০।*
১৩. *মির'আত ৫/৩১।*

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১৪]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : প্রথমে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'[১৫] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৬], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৭]

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ বুখারী *(হা/৯৫৬, ৯৭৭; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯)* ও মুসলিম *(হা/৮৮৫, ৮৮৯)* সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৮]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন এবং সুন্নাত তরক করার জন্য গোনাহগার হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১৯] এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন', যা 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন।[২০] তবে এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী প্রমুখ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২১] অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতি থাকলে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

১৪. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ৬/১৪৪-৪৫)*। এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে

---

১৪. মিশকাত হা/১৪৪১; মির'আত হা/১৪৫৫ এর আলোচনা, ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃ.; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।
১৫. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩।
১৬. ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৭. ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৫/৮৪ পৃ.।
১৮. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২০. মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.।
২১. মির'আত ৫/৭২-৭৩।

কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয বলেছেন।[২২] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[২৩] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৪] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে'।[২৫] উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[২৬]

১৫. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন।[২৮] 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[২৯] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, –'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৩০] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে সকল উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[৩১]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩২] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।[৩৩] ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে'।[৩৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' কুরবানী করেছেন।[৩৫] বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।[৩৬] অন্যদেরকে সাতজনে একটি উটে বা গরুতে শরীক হ'তে বলেন।[৩৭] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৭. কুরবানীতে শরীক হওয়া : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (ক) 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[৩৮] সম্ভবতঃ তাঁরা কোন শহরে অবস্থান করছিলেন। যেখানে ঈদুল আযহা উপস্থিত হয় *(মিরক্বাত)*।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (১০ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৯] (ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরেও আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একইভাবে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৪০] সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বন্টন সহজ হয়। জমহূর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[৪১]

---

২২. *মির'আত ৫/৮১।*
২৩. *কিতাবুল উম্ম ২/২২৩ পৃ.।*
২৪. *আহমাদ হা/১৮৬৯৭, ১০৪৮, ১০৬১; তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।*
২৫. *মির'আত ৫/৯৯।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; বায়হাক্বী হা/১৮৮২৬, ৯/২৬৭; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৪৬১।*
২৭. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।*
২৮. *মির'আত ৫/৮০ পৃ.।*
২৯. *মির'আত ৫/৭৮-৭৯।*
৩০. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।*
৩১. *মিশকাত ১৪৫৪ হাদীছের টীকা।*
৩২. *তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।*
৩৩. *তিরমিযী হা/১৫০৫।*
৩৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮।*
৩৫. *বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩।*
৩৬. *বুখারী হা/৫৫৫৯; মুসলিম হা/১২১১।*
৩৭. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
৩৮. *তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ।*
৩৯. *মুসলিম হা/১৩১৮।*
৪০. *মুসলিম হা/১৩১৮।*
৪১. *মির'আত ৫/৮৪ পৃ.।*

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি বছর মদীনায় কুরবানী করেছেন।[৪২] কিন্তু তিনি বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো ভাগা কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা একেবারেই ভিত্তিহীন। অথচ কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি করেননি বা করতে বলেননি, সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল হবে? আজকাল অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দিচ্ছেন, আবার একটি গরুর ভাগা নিচ্ছেন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন?

১৮. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৪৩] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৪৪]

১৯. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[৪৫] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[৪৬] তবে ১৩ তারিখেও জায়েয আছে।[৪৭]

২০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৪৮]

২১. যবহকালীন দো'আ : **(১)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পড়া মাকরূহ'।[৪৯] (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৫০]

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই।[৫১] কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৫২] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৫৩]

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে প্রখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[৫৪]

২৪. কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে।[৫৫] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে।

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৫৬]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৫৭]

[বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]

---

৪২. তিরমিযী হা/১৫০১; মিশকাত হা/১৪৭৫; মির'আত ১/১১০ পৃ.।
৪৩. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
৪৪. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।
৪৫. সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ৫/৭৫ প্রভৃতি।
৪৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০।
৪৭. মির'আত ৫/১০৬।
৪৮. বুখারী হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।
৪৯. মির'আত ৫/৭৪ পৃ.।
৫০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১১/১১৭ পৃ.।
৫১. মির'আত ৫/১২০।
৫২. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮, সনদ হাসান।
৫৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৫৪. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮; মির'আত ৫/৯৪ পৃ.।
৫৫. মির'আত ৫/১২১; তওবা ৬০।
৫৬. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃ.।
৫৭. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃ.।

করোনা ও মানবতার জয়-পরাজয়

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

দেখতে দেখতে করোনাকালের ছয় মাস চলে গেল। মৃত্যুর মিছিলে ইতিমধ্যে যোগদান করেছে পাঁচ লক্ষাধিক বনু আদম। আক্রান্ত হয়েছে এক কোটিরও বেশী। আক্রান্তের হার এক দেশে কমছে তো অন্য দেশে বাড়ছে। প্রথমে কিছুটা কম প্রাদুর্ভাব থাকা দক্ষিণ এশিয়ায় হঠাৎ করেই পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেছে। কোথায় এর শেষ কেউ জানে না। চারিদিকে বাড়ছে হতাশার অমানিশা। অনিশ্চয়তায় ডুবে গেছে ভবিষ্যতের সকল ভাবনা। সবাই অধীর অপেক্ষায় রয়েছে যাবতীয় শংকা আর উদ্বিগ্নতা কাটিয়ে কবে ফিরবে সুদিন। পৃথিবী আবার কবে ফিরবে তাঁর আপন চেহারায়।

করোনার এই মহাবিপদকাল আমাদের চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর অমোঘ বাস্তবতা। মানবতার এই চরম দুঃসময় মানুষের ভেতরটা একদম নগ্ন করে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিপদে পড়লে যে কেউ কারো নয়, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা নিত্যই দেখছি করোনার এই দুর্যোগকালে। আতঙ্কের মধ্যে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তান সব সম্পর্কগুলো মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। মানুষ অমানুষ হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে মানবিক আচরণ বজায় রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। অবশ্য এর বিপরীতপীঠে এমন অনেক দৃষ্টান্ত মিলছে যেখানে মানবিক দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, যা মানুষের মনে আস্থা ও প্রশান্তির অনাবিল সুবাতাস যুগিয়েছে। মানবসভ্যতা বোধহয় আরও বহুদিন ইনশাআল্লাহ টিকে থাকবে কেবল এই মহানুভব মানুষগুলোর জন্যই। এভাবে কখনও মানবতার মর্মন্তুদ পরাজয়, কখনও মহত্তম বিজয়ের দোলাচলে যাপিত হচ্ছে আমাদের করোনাকালের নিত্যদিন।

করোনাকালে আমাদেরকে সবচেয়ে ভাবিত করেছে মানবতার পরাজয়ের সকরুণ দৃশ্যগুলো। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সভ্যতা, আধুনিকতা কোন কিছুই আমাদের ভেতরকার পাশবিকতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। মানুষ যে বিপদের সময় তার সর্বাধিক প্রিয় মানুষগুলোকেও এভাবে অবহেলায়, অনাদরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে, তা করোনা না এলে হয়ত জানা হ'ত না। যে দৃশ্যগুলো কেবল কঠিন কিয়ামত দিবসের কথা ভেবে আমরা কল্পনা করতাম, তা আজকের পৃথিবী জুড়ে চাক্ষুষ বাস্তবতা। সুবহানাল্লাহ! কিয়ামত দিবস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে, নিজের মাতা-পিতার কাছ থেকে, স্ত্রী ও সন্তান থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর বিপদ থাকবে যা নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত থাকবে' *(আবাসা ৩৪-৩৭)*। সে এতটাই দুশ্চিন্তামগ্ন থাকবে যে, নিজের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব থেকেও অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া হয়ে যাবে। কেউ কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার মত অবস্থায় থাকবে না। যে মানুষ আখেরাতের তুলনায় অতীব তুচ্ছ বিপদে এভাবে পরম আত্মজনকে ছেড়ে যেতে পারে, কিয়ামতের ভয়াবহ বিপদকালে তার অবস্থা কী হ'তে পারে তা বলাই বাহুল্য। কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যপটের বাস্তবতা আমরা তাই প্রতিনিয়তই অনুভব করছি। সৌভাগ্যক্রমে আমরা অদ্যাবধি এই দৃশ্যগুলোর অংশ নই। কেউ এর অংশ হোক তা পরম শত্রুর জন্যও কাম্য নয়।

আমরা দেখেছি করোনায় আক্রান্ত শিশু সন্তানকে রংপুর মেডিকেল থেকে ঢাকায় ট্রান্সফারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু মেডিকেল থেকে স্ট্রেচারে এ্যাম্বুলেন্সে তুলতে হবে, এটুকুর জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সন্দেহভাজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর দায়ে একজন হাফেযকে মারধর করেছে স্থানীয় জনগণ। সিরাজগঞ্জের সন্দেহভাজন করোনা উপসর্গের রোগী বহনের দায়ে নৌকায় দেয়া হয়েছে আগুন আর মাঝিকে পিটুনি।

জামালপুরে জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার পরিবারের লোকজন ঢাকা থেকে নিজ যেলায় লাশ নিয়ে এলে এলাকাবাসী দাফনে বাধা দেয়। পরে ঢাকা থেকে একটি বেসরকারী সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক দল এসে সেই ব্যক্তির কবর খোঁড়ে এবং জানাযা পড়ায়। এখানেই শেষ নয়, সেই ব্যক্তির দাফনের পর তার স্ত্রী ও সন্তানকে গ্রামবাসী তালা দিয়ে আটকে রাখে। কোন আত্মীয়-স্বজনকে তার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেয়নি। মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাবার দেয়ার নিয়ম প্রতিবেশীদের। সেই সুযোগও দেয়া হয়নি। অনাহারী সেই পরিবারটি প্রতিবেশী কয়েকজনকে বাজার করে দেয়ার অনুরোধ করলে, তখন তাদেরকেও হুমকি দেয়া হয়ে যে, কেউ বাজার করে দিলে তাদেরকেও ঘরে তালা মেরে দেয়া হবে। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এর সুরাহা হয় বটে; কিন্তু পরিবারটিকে একঘরেই করে রাখা হয়। তাদের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও গ্রামবাসী তা বিশ্বাস করেনি। পরিবারের কর্মক্ষম মানুষটির মৃত্যুবরণে তাদের শোকাহত হওয়ারও অধিকার ছিল না। মানুষ তাদের সান্ত্বনা দেয়া তো দূরের কথা, কেউ তাদের সাথে কথাও বলেনি। এই পরিবারটি জানে না মানুষ কি আগে থেকে এরকম অমানবিকই ছিল, নাকি এখন করোনার কারণে হয়েছে।

ফেনীর সোনাগাজীতে অবতারণা হয় আরো বীভৎস দৃশ্যের। জনৈক সাহাবুদ্দীন (৫৫) চট্টগ্রাম থেকে করোনার উপসর্গ নিয়ে গ্রামে ফিরেন। কয়েকদিন পর হাসপাতালে নমুনা দিয়ে দুপুরে বাড়ী ফেরার পর পরিবারের লোকজন তাকে একটি ঘরে একা রেখে বাহির থেকে দরজায় ছিটিকিনি লাগিয়ে রাখে। দেয়া হয়নি দুপুরের খাবার। বিকেলে তার শ্বাসকষ্ট ও কাশি বেড়ে যায়। এসময় তিনি চিৎকার করে খাবার চাইলেও কেউ দেয়নি। পানি চেয়েও পায়নি। বাড়িতে ছিল তার স্ত্রী, তিন কন্যা, তিন জামাতা ও ছোট ছেলে। ছেলেটি বাবার সাহায্যে এগিয়ে যেতে চাইলে বোনেরা বাধা দেয়। এভাবে ঘরবন্দী অবস্থায় চিৎকার করতে করতে রাত ১০টার দিকে

তার মৃত্যু ঘটে। অবশেষে ছোট ছেলের চিৎকার শুনে রাত একটার দিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান এগিয়ে আসেন এবং দাফনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দাফনের জন্য স্থানীয় মসজিদের খাটিয়া দিতে অস্বীকার করা হয়। এমনকি কবর খোঁড়ার জন্য কোদালও দেয়নি কেউ।

গাজীপুরের এক মাকে তার নিজ সন্তানরা করোনা আক্রান্ত সন্দেহে গাড়িতে করে এনে টাঙ্গাইলের শফিপুরের জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রশাসন তাকে উদ্ধার করে এবং সেই মায়ের করোনা টেস্ট নেগেটিভ এসেছিল। অন্যদিকে এক পিতা-মাতা তাদের চৌদ্দ বছরের সন্তানকে কিছু টাকা, পানি আর পাউরুটি দিয়ে রাতের আঁধারে বাঁশঝাড়ে ফেলে পালায় চট্টগ্রামের লোহাগড়ায়। ফজরের পর এক বৃদ্ধাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরানো অবস্থায় দেখতে পেলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। দুনিয়াতে পিতা-মাতাই মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারাই যদি সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তবে পরিস্থিতি কতটা অমানবিক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে তা কল্পনা করা যায়? অনুরূপভাবে বগুড়ায় ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধকে করোনা সন্দেহে তার স্ত্রী বাড়ি থেকে বের করে দেয় বৃষ্টিভেজা রাতে। বৃদ্ধের ছেলে-মেয়েরা নীরবে সে দৃশ্য দেখলেও তাদের অন্তরে মায়া হয়নি। পরে পুলিশ তাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে।

এছাড়া এই হাসপাতাল সেই হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন রোগীর সংখ্যা অগণিত। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে ভাড়াটিয়ারা বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইছেন না বা বাড়ি ছাড়ার জন্য নোটিশ দিয়েছেন এমন উদাহরণের তো কোন অভাব নেই। এমনকি এক স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে সারারাত ঢিল ছুঁড়ে তার পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করার চেষ্টা চালিয়েছিল তার প্রতিবেশীরা। হাসপাতালে বাবার লাশ রেখে ছেলেরা পালিয়েছে, রাতের গভীরে নাম-পরিচয়হীন লাশ রাস্তায় পড়ে থাকছে, জানাযা-দাফনের জন্য পরিবারের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন খবর পাওয়া গেছে হরহামেশাই। এছাড়া খবরের বাইরেও রয়েছে এমন বহু খবর। এপ্রিলের পত্রিকাগুলো তো সরগরম ছিল ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বরদের চাউল/ত্রাণসামগ্রী চুরির ধারাবাহিক প্রতিবেদনে।

মানবতার এমনতরো করুণ বিপর্যয়দৃশ্য দেখার পাশাপাশি আমরা দেখেছি নিজের জীবন বিপন্ন করে ডাক্তার, পুলিশসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও সাধারণ মানুষ কীভাবে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়েছে যখন দেখেছি শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপযেলার অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক নাজীমুদ্দীন নিজের বাড়ি বানানোর জন্য জমানো দশ হাযার টাকা করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সেবায় দান করেছেন। আমাদের উজ্জীবিত করেছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মাকছুদুল আলম খোরশেদ ও তার বাহিনী কর্তৃক শতাধিক লাশ দাফনের কাহিনী, যে লাশগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত দাফন করতে রাজি হয়নি করোনার ভয়ে। দেশের প্রতিটি প্রান্তে গোচরে-অগোচরে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং হৃদয়বান ব্যক্তিরা সাধ্যমত অভাবী মানুষের দুয়ারে খাদ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা পৌঁছে দিয়েছে। মানুষ মানুষের জন্য-এই মহানব্রতকে অক্ষুণ্ন রেখে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এভাবে বহু মানুষ যাবতীয় বিপদাপদকে তুচ্ছ করে সমাজসেবার ময়দানে তৎপর ছিলেন মাশাআল্লাহ। আমরা তাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আলাহ তাদের এই মহান খেদমত কবুল করুন। আমীন!

করোনার এই বিপর্যয়কাল আর কতদিন দীর্ঘায়িত হবে তা আমরা জানি না। হয়তবা মুক্তির দিন সন্নিকটে কিংবা দূরে। তবে মানবতার জয়-পরাজয়ের যে চাক্ষুষ দৃশ্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে তা নিশ্চয়ই বর্তমান প্রজন্মের হৃদয়কন্দরে গভীর চিন্তার খোরাক যোগাবে। এই প্রজন্ম যুদ্ধ দেখেনি, সামষ্টিক কোন সংগ্রামের দৃশ্য দেখেনি, কিন্তু দেখেছে করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। এ এমন এক ক্রান্তিকাল, যুগান্তরের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। দৃশ্যমান কোন শত্রু ছাড়াই যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্ত এভাবে অজানা আতংকে স্থবির ও নিস্তব্ধ হ'তে পারে, তার কোন উদাহরণ আমাদের জানা নেই। একটি বিশ্বযুদ্ধও বোধহয় এতটা প্রলয়ংকরী হ'তে পারত না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নতির এই যুগে এই অচিন্তনীয় ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে, মানবজাতি প্রকৃতই কতটা অসহায়, কতটা পরমুখাপেক্ষী। কেবল স্বাস্থ্যব্যবস্থাই নয়, গোটা বিশ্বব্যবস্থাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে সামান্য অদৃশ্য অণুজীব মোকাবিলার ব্যর্থতায়। জাতিসংঘের মহাসচিব আফসোস করে বলেছেন, 'এটা একেবারে সত্য যে এখন বিশ্বে নেতৃত্বের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশ্ব নেতৃত্বে আরও বেশী বিভক্তি দেখা দিয়েছে, যা চরম উদ্বেগের বিষয়'। এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই বিশ্ব মানবসমাজকে আপন সীমাবদ্ধতাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেবে। সীমালংঘনের পর সীমালংঘন করে যারা নিত্যই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছিল, তারা তাদের পরিণতির কথা নিশ্চয়ই ভাববে। যারা অর্থ-বিত্ত ও আর ক্ষমতার মিথ্যা মোহে জীবনপাত করে চলেছিল, তারা জীবনের উল্টো পিঠ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নেবে। অন্যায়-অবিচার ছিল যাদের দৈনন্দিন বিনোদনের অংশ, এই রুঢ় অভিঘাত তাদের মাঝে নতুন জীবনবোধের উন্মেষ ঘটাবে। আর এই মহৎ উপলব্ধি থেকেই হয়ত জন্ম নেবে মানবতাবোধের নয়া সবক। যে সবক মানুষকে মানুষের প্রতি অধিকতর সহমর্মী করে তুলবে। অর্থহীন হিংসা-হানাহানির পথ ছেড়ে অর্থপূর্ণ মানবিক জীবনের পথে পরিচালিত করবে। আর এই পথ ধরেই তারা একদিন মহান স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণের চিরন্তন বার্তাকে প্রাণ উজাড় করে স্বাগত জানিয়ে ধন্য হবে। এটাই হোক আমাদের সর্বাঙ্গীন কামনা। আলাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে করোনাকালে মানবতার এই সবক নতুনভাবে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। যাবতীয় অমানবিকতা ও পাপ-পঙ্কিলতার গহীন অন্ধকার থেকে সত্য ও সুন্দরের আলোকময় পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

কোথায় মিলবে চিকিৎসা?

মুহাম্মাদ আবু নোমান

কোথায় গেলে মিলবে ডাক্তার? কোথায় পাওয়া যাবে চিকিৎসা? দেশের মানুষের কাছে বর্তমানে এটি একটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। রোগ যাই হোক, রোগী যে বয়সেরই হোক, দুর্দশা চরমে। কোভিড-১৯ রোগী নন, অথচ তারাও সুচিকিৎসা না পেয়ে মারা যাচ্ছেন বলে তাদের স্বজনরা গণমাধ্যমের কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অভিযোগ করছেন। এ ধরনের খবরে দেশবাসী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও অদক্ষতা ফুটে উঠে। বিশেষ করে বিত্তহীন মানুষ সরকারী হাসপাতালে যতটুকুই চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকেন, তাদের জন্য খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে। চিকিৎসাসেবার এ অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছে মানুষ। তারা চিকিৎসার জন্য যাবেন কোথায়?

সেবা পেতে রোগীদের ভোগান্তি, হয়রানি, সেবা না পাওয়া, লাগামহীন সেবামূল্য আদায়, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নযরদারীর অভাব ইত্যাদি সমস্যা সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালগুলোর নিত্যদিনকার চিত্র হ'লেও কার্যত কোন ক্ষেত্রেই মন্ত্রণালয় সফল হয়নি। এ অবস্থা চলতে থাকলে করোনার চেয়ে সাধারণ রোগে আক্রান্ত অনেক বেশী মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে। করোনা আতঙ্কের সাথে যদি সাধারণ চিকিৎসা বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা মনে করি, করোনার চিকিৎসার সাথে সব ধরনের সেবা কার্যক্রম চলমান রাখাসহ যে কোন মূল্যে সাধারণ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

চিকিৎসাসেবা পাওয়া মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। একদিকে করোনা আতঙ্ক, অন্যদিকে যদি অন্য জটিল রোগে আক্রান্তরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন, তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, এই পরিস্থিতি কতটা ভীতিপ্রদ। সঙ্গত কারণেই এই অবস্থা আমলে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, বাত, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কিডনী, টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, ইনফুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্তরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দেখা পাচ্ছেন না। সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। আর চিকিৎসকের অভাবে সেবা না পেয়ে অনেক রোগী হাসপাতাল ছাড়ছেন। হাসপাতালে গিয়ে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে অনেক রোগী ঘরেই রোগ পুষছেন। সব মিলিয়ে একটি আতঙ্কজনক অবস্থা বিরাজ করছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেশের হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক সুরক্ষা সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে চিকিৎসকদের কেন এতো ভয়? বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার চেয়ে বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছে অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না দেয়ার কারণে। করোনার কারণে অন্য রোগীরা চিকিৎসা পাবেন না, এ পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধরা, যারা আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ, ঠাণ্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন, তাদের নিয়মিতই যরূরী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সময়মতো চিকিৎসার অভাবে তারা প্রাণ হারাতে পারেন। কাজেই এ অচলাবস্থার অবসান যরূরী। চিকিৎসা একটি মহৎ পেশা বলে স্বীকৃত। এমন নযীরও রয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে অনেক চিকিৎসক রোগীর সেবা দিয়েছেন।

সরকার করোনা মোকাবিলায় বিভাগ ও যেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন ও বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে প্রতিনিয়ত সমন্বয় সভা করলেও রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু সেবা না পেয়ে মানুষের অসন্তোষের মাত্রা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এছাড়া করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত হাসপাতালেই পদে পদে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেকেই হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতালবিমুখ হয়ে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের অনেকে গোপনীয়তা রক্ষা করে হয়রানি ও ভোগান্তি এড়াতে বাসায় থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

একের পর এক হাসপাতাল ঘুরে কিডনী জটিলতায় মারা যান অতিরিক্ত সচিব গৌতম আইচ সরকার। রাজধানীর ল্যাবএইড, স্কয়ার, ইউনাইটেড, সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রিজেন্ট হাসপাতাল, আনোয়ার খান মডার্নসহ আরও কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও সরকারী কর্মকর্তা পিতার চিকিৎসা করাতে পারেননি মেয়ে ডা. সুস্মিতা আইচ। গত ১৯শে এপ্রিল রাজধানীর ১১টি হাসপাতাল ঘুরেও স্বামী আমিনুল ইসলামের চিকিৎসা পাননি স্ত্রী মিনু বেগম। সর্বশেষ অ্যাম্বুলেন্সে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মারা যান তিনি। এছাড়া ৩ ঘণ্টা হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে বিনা চিকিৎসায় করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের যুবক রিমন সাউদ। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে হার্ট অ্যাটাক করেন পিতা ইয়ার হোসেনের। রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী ছয়টি হাসপাতালে সারাদিন ঘুরেও ভর্তি হ'তে পারেননি শেওড়াপাড়ার বাসিন্দা রেবেকা সুলতানা চৌধুরী। করোনাভাইরাস নেই, এমন নথি দেখাতে না পারাসহ নানা অযুহাতে ঐ নারীকে কোন হাসপাতালেই ভর্তি রাখা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৯ ঘণ্টা ধরে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে বিকেল ৫-টায় অ্যাম্বুলেন্সেই তার মৃত্যু হয়। স্বজনরা জানান, অসুস্থ হওয়ার পর রোগী নিয়ে তারা বিআরবি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, বারডেম, ইউনিভার্সাল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার জন্য মুগদা হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছিলেন।

কোন হাসপাতালেই ভর্তি কিংবা করোনার পরীক্ষা করাতে

পারেননি। পান্থপথ ও গ্রিন রোডসহ রাজধানীর বেশকিছু হাসপাতালে ঘুরেও ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত শিশুকে ভর্তি করতে পারেননি কলেজ শিক্ষক পিতা। রাজধানীর যে বাসায় শিশুটি উঠেছিল, প্রতিদিন হাসপাতালে ঘোরার কথা শুনে সে বাসা থেকেও অভিযোগ আসে। ফলে বাধ্য হয়ে ২০-২২ দিন রাজধানীতে থেকে চিকিৎসা না পেয়ে শিশুকে নিয়ে টাঙ্গাইলে ফিরতে বাধ্য হন পিতা-মাতা। পরে শিশুটি বাসায় মারা যায়।

হাসপাতালে রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না, এ বিষয়টি ভাবা যায়? বলা হয়েছিল, কোভিড ও নন-কোভিড রোগীদের জন্য পৃথক চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, যাতে কেউ চিকিৎসাবঞ্চিত না হয়। যরূরী রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে হাসপাতাল থেকে রোগী ও তার স্বজনদের টেস্ট করানোর জন্য রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে। নইলে এমন রোগী নিয়ে স্বজনরা টেস্টের জন্য কোথায় দৌড়ঝাঁপ করবেন? স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে চিন্তা করা যরূরী।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগী ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবসম্মত নয় বলে অনেকে মনে করেন। শুধু নির্দেশনা দিলেই হয় না, সেটি কার্যকরের বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িত। একটি নির্দেশনায় বলা হয়, সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালে কোন মুমূর্ষু রোগী কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত বলে যদি সন্দেহ হয়, কোন কারণে ওই হাসপাতালে ভর্তি করানো যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে রোগীকে অপেক্ষমাণ রেখে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষের চারটি নম্বরের যে কোনটিতে ফোন করে ঐ রোগীর চিকিৎসা বা ভর্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ নিতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, স্বাস্থ্য অধিদফতরের ঐ নির্দেশনার পরও করোনার উপসর্গ নিয়ে কোন রোগী সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হ'তে গেলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। করোনা সন্দেহভাজন রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে পৃথক আইসোলেশন হাসপাতাল চালু করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। প্রাথমিকভাবে রোগী সেখানে ভর্তি হবে। এরপর পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ হ'লে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে এবং করোনা নেগেটিভ হ'লে রোগের ধরন অনুযায়ী অন্য হাসপাতালে ভর্তি হবেন।

চলতি বছরের জানুয়ারী মাসের এক গবেষণার বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানায়, জনসংখ্যার অনুপাতে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম বাংলাদেশে। নেপালে প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য আইসিইউ আছে ২.৮টি, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ২.৩টি, পাকিস্তানে ১.৫টি, মিয়ানমারে ১.১টি আর বাংলাদেশে আছে দশমিক ৭টি। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য একটি আইসিইউ-ও নেই। দেশের স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর এই পরিস্থিতি কারোরই অজানা নয়। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি 'একনেক'-এর সভায় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারী মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দু'টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এর মধ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় দেশের সব যেলা হাসপাতালে অন্তত একটি করে পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ ইউনিট স্থাপনের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। করোনা মহামারী দেশের স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর এসব দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এখন এসব দুর্বলতা দূর করতে অবশ্যই স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো উচিত বলে আমরা মনে করি।

মূলত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হ'লে দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশের মানুষের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সাধারণ শিষ্টাচার মেনে চলাসহ সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। মানুষ যদি তাদের পূর্বের অভ্যাস, আচরণ ও কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থেকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেয় তাহ'লে তা প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিস্তার ও সংক্রমণে সহায়ক হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ওয়াকিফহাল মহল মনে করে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হ'লে স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জনঅংশগ্রহণমূলক স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়ন করতে হবে। সেবা কর্মকাণ্ডকে নাগরিক পরিবীক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। রোগী ফেরতদানের ঘটনা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেটা সংশ্লিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যরূরী। করোনা রোধের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের চিকিৎসাসেবাও নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক এমনটিই কাম্য।

॥সংকলিত॥

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) উপমহাদেশের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দ্বীন, অবিসংবাদিত ধর্মতাত্ত্বিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুনাযির, অনলবর্ষী বাগ্মী, মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক, সম্পাদক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তবে মুনাযির বা তার্কিক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বিশ্বময়। 'শেরে পাঞ্জাব' (পাঞ্জাবের সিংহ) ও 'ফাতিহে কাদিয়ান' (কাদিয়ান বিজয়ী) মুনাযির খ্যাত মাওলানা অমৃতসরী বাহাছ-মুনাযারার ইমাম ও মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। এক হাযারের অধিক মুনাযারায় অংশগ্রহণ করে তিনি এক বিরল নযীর স্থাপন করেছিলেন। খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী সহ যেকোন বাতিল ফিরক্বা ও ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে যে নির্ভীক সৈনিকটি সর্বাগ্রে ময়দানে আবির্ভূত হতেন তিনি হলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। বলা হয়ে থাকে, ইসলামের বিরুদ্ধে রাত্রির গভীর অন্ধকারে যদি কোন ফিরক্বার আবির্ভাব ঘটে তাহলে সকাল বেলায় অমৃতসরী তার জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। বক্তব্য, লেখনী ও মুনাযারার মাধ্যমে তিনি ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ও তার বশংবদদের বিরুদ্ধে হিমাদ্রিসম ঈমানী দৃঢ়তা ও অসীম সাহসিকতার সাথে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র এক অমূল্য রত্ন ও সম্পদ ছিলেন।

> **খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী সহ যেকোন বাতিল ফিরক্বা ও ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে যে নির্ভীক সৈনিকটি সর্বাগ্রে ময়দানে আবির্ভূত হতেন তিনি হলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী।**

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৮৬৮ সালে (১২৮৭ হিঃ) ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের আদি ভিটা ছিল কাশ্মীরের ইসলামাবাদ যেলার (বর্তমানে অনন্তনাগ)[১] ডোর এলাকায়। তাঁর পিতা খিযির জূ পশমী কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৬০ সালের দিকে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা কাশ্মীরের ডোগরা রাজা রণবীর সিং-এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অমৃতসরে বসতি গড়েন।[২] ছানাউল্লাহ অমৃতসরী নিজেই বলেছেন, 'আমি পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা খিযির জূ ও আমার চাচা আকরাম জূ কাশ্মীরের শ্রীনগরের ইসলামাবাদ যেলা (বর্তমানে অনন্তনাগ) থেকে অমৃতসরে হিজরত করেন। পশমী কাপড়ের ব্যবসা করার জন্য তাঁরা দু'জন এ শহরে আসতেন। কাশ্মীরী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি পরিবারকে 'মিন্টু' বলা হত। এটি ব্রাহ্মণদের একটি শাখা। তাঁরা (অর্থাৎ আমার পিতা ও চাচা) এই পরিবারের সন্তান'।[৩] কাশ্মীরী পণ্ডিতদের অপর শাখা 'নেহরু'-এর মতো 'মিন্টু'কেও সমাজের মানুষ অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত।

অমৃতসরীর পূর্বপুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কে এবং কখন ইসলাম গ্রহণ করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[৪] ধারণা করা হয়, কাশ্মীরের মুসলিম গভর্ণর যয়নুল আবেদীন শাহের (মৃঃ ৮৭৭ হিঃ) শাসনামলে তাঁর পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[৫] 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে বলা হয়েছে, أسلم آباؤه في القديم 'তাঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীনকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন'।[৬]

দুঃখের অথৈ সাগরে ভাসমান জীবন তরী :

৭ বছর বয়সে ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর দগদগে ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই কিছুদিন পর পিতৃত্বের শূন্যতা পূরণে যৎকিঞ্চিৎ সচেষ্ট চাচা মুহাম্মাদ আকরামও পরপারে পাড়ি জমান। পিতা ও চাচার মৃত্যুতে শিশু অমৃতসরীর জীবনে ঘোর অমানিশা নেমে আসে। তখন পরিবারে তার একমাত্র সহায় ছিল বড় ভাই মুহাম্মাদ ইবরাহীম। কিন্তু তার অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। কাপড় রিফু করে কোন মতে তার দিন চলত। এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জীবন-জীবিকার তাগিদে তিনি বড় ভাইয়ের কাছে রিফু করা শেখেন এবং এতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৪ বছর বয়সে মাতার জীবন প্রদীপও নিভে যায়। ফলে স্নেহ-মমতার পরশের শেষ আশ্রয়স্থল ও সুতোটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৭] অভাব-অনটন ও দুঃখের অথৈ

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. অনন্তনাগ যেলাটি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং অমৃতসর লাহোর থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত।

২. মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী, সীরাতে ছানাঈ (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৮৯), পৃঃ ৯০; মুহাম্মাদ মুর্তাযা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ, আশ-শায়খ ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী ওয়া জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ, অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ, পৃঃ ১৪।

৩. আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহূদুহু আদ-দা'বিয়াহ ওয়া আছারুহু আল-ইলমিইয়াহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ২০১৬), পৃঃ ৫১। গৃহীত : নেদায়ে মদীনা, কানপুর, 'শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী' সংখ্যা, ১৯৪৯, পৃঃ ২৪।

৪. মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (বেনারস : জামে'আ সালাফিইয়াহ, ১৯৭৯), পৃঃ ১৮।

৫. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৯১; মুহাম্মাদ মুর্তাযা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৬. নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫ (মাকতাবা শামেলা)।

৭. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৯৮, ১০২, ১০৬; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১৮।

সাগরে ভাসমান নিজের জীবনের নিষ্করুণ দৃশ্যকল্প তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এভাবে এঁকেছেন, ‘আমার বয়স যখন ৭ বছর তখন আমার পিতা মারা যান। অতঃপর আমার চাচাও মারা যান। আমার বড় ভাই মুহাম্মাদ ইবরাহীম কাপড় রিফু করার কাজ করতেন। তিনি আমাকে এই কাজ শেখান। আমি যখন ১৪ বছরে উপনীত হই তখন আমার মাও মারা যান। আমার পিতার আমরা চার সন্তান ছিলাম। তিন ভাই ইবরাহীম, ইসহাক ও ছানাউল্লাহ এবং এক বোন’।[৮]

জীবনের মোড় পরিবর্তন :

একদিন ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দোকানে কাপড় রিফু করছিলেন। ইত্যবসরে একজন আলেম একটি দামী জুব্বা রিফু করার জন্য নিয়ে আসেন। তিনি সময়মতো জুব্বাটি রিফু করে ফেরৎ দিলে সেই আলেম তার কাজের দক্ষতা দেখে খুব খুশী হন। এ সময় কিছু দ্বীনী আলোচনাও হয়। মাওলানা ছাহেব যুবক অমৃতসরীকে কিছু প্রশ্ন করেন। তিনি সেগুলোর যুক্তিসংগত উত্তর প্রদান করেন। মাওলানা তার উত্তর শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান এবং কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করেন, ‘বৎস! তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ’? এ প্রশ্ন শুনে তার দু’চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি ভগ্নহৃদয়ে উত্তর দেন, ‘আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন। এখন না আছে পড়ানোর মতো কেউ আর না আছে উপার্জন করে দু’লোকমা মুখে তুলে দেওয়ার মতো কেউ। জামা-কাপড় রিফু করে যে দু’চার পয়সা কামাই করি তা দিয়ে কোনমতে দিন চলে যায়’।

একথা শুনে মাওলানা ছাহেব একজন দক্ষ জহুরির ন্যায় উপদেশের সুরে তাকে বললেন, ‘তুমি অবশ্যই পড়াশুনা করবে। তোমার মেধা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তুমি যদি লেখাপড়া না করো তাহলে নিজের নফসের উপরে যুলুম করবে’। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। তাঁর নছীহত যুবক অমৃতসরীর মানসপটে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি রিফু করার পাশাপাশি পড়াশোনা আরম্ভ করে দিলেন।

আসলে আল্লাহ্‌র হিকমত ও ফায়ছালা ছিল অন্য রকম। অমৃতসরী মানুষের ছেঁড়া কাপড় রিফু করার পরিবর্তে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমানের জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক রিফু করবেন এবং ইসলামের উপর আগত মুহুর্মুহু হামলা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন- এমনটিই তাঁর ভাগ্যলিপি ছিল। এজন্য মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সামনে জ্ঞানার্জনের পথকে প্রশস্ত করে দেন। এটি ছিল আল্লাহ তা‘আলার এক অপার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সেই অনুগ্রহে সিক্ত করেন।[৯] মহান আল্লাহ বলেন, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ‘অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ *(ইউসুফ ১২/২২)*।

জ্ঞানার্জনের পথে অমৃতসরী :

তিনি কতিপয় ফার্সী কিতাব পড়ার পর সমকালীন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরীর (মৃ: ১৯১৬) দরসে হাযির হন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ‘চৌদ্দ বছর বয়সে আমার পড়ার আগ্রহ জন্মায়। প্রাথমিক ফার্সী কিতাবপত্র পড়ার পর অমৃতসরের ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা আহমাদুল্লাহ ছাহেবের নিকট পৌঁছি। রিফুগিরির কাজ করতে থাকি এবং মরহূমের নিকট সবকও পড়তে থাকি। শরহে জামী ও কুতবী পর্যন্ত মৌলভী ছাহেবের কাছে পড়ি। অতঃপর হাদীছের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে উস্তাদে পাঞ্জাব মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদীর খিদমতে হাযির হই। ওখানে সিলেবাসভুক্ত কিতাব সমূহ পড়ে সনদ হাছিল করি। এটি ১৩০৭ হিঃ মোতাবেক ১৮৮৯ সালের ঘটনা। এরপর শামসুল ওলামা মাওলানা সাইয়িদ নাযীর হুসাইন ছাহেবের (রহঃ) খিদমতে হাযির হই। পূর্বোক্ত সনদ দেখিয়ে তাঁর নিকট থেকে ‘ইজাযত’ বা পাঠদানের অনুমতি হাছিল করি।[১০] অতঃপর কয়েকদিন (মাযাহিরুল উলূম মাদরাসা) সাহারানপুরে অবস্থান করে (১৩০৭ হিজরীতেই) দেওবন্দে পৌঁছি। সেখানে মা‘কূল ও মানকূল-এর সিলেবাসভুক্ত সব ধরনের বই পড়ি। মা‘কূলের কিতাব সমূহের মধ্যে কাযী মুবারক, মীর যাহেদ, ছদরার উমূরে ‘আম্মাহ, শামসে বাযেগাহ প্রভৃতি এবং মানকূলাতের মধ্যে হেদায়া, তাওযীহ, মুসাল্লামুছ ছুবূত প্রভৃতি, অংক শাস্ত্রের শরহে চগমনী প্রভৃতিও পড়ি এবং দাওরায়ে হাদীছে অংশগ্রহণ করি। উস্তাদে পাঞ্জাব-এর দরসে হাদীছ এবং দেওবন্দের শিক্ষকমণ্ডলীর দরসে হাদীছ দু’টোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা থেকে উপকৃত হই। দেওবন্দের সনদ আমার জন্য গর্বের বিষয়, যেটি আমার নিকট মওজূদ রয়েছে’।[১১]

অমৃতসরীর প্রতি শায়খুল হাদীছ ওয়াযীরাবাদীর স্নেহাশিস :

উসতাদে পাঞ্জাব খ্যাত হাফেয মাওলানা আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী একবার বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করেছ? তখন আমি

৮. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫। গৃহীত: নেদায়ে মদীনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।*
৯. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১০৭-১০৮; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১৮-১৯।*
১০. *২৩শে জানুয়ারী ১৯৪২ সংখ্যার ‘আহলেহাদীছ’ পত্রিকায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, ‘দেওবন্দে অবস্থানকালীন সময়েই আমি হযরত মিয়াঁ ছাহেব দেহলভীর খিদমতে হাযির হয়ে সনদ হাছিল করে নিয়েছিলাম’। এ উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট থেকে সনদ লাভের ঘটনা পাঞ্জাব থেকে ফারেগ হওয়ার পরপরই ঘটেনি। বরং দেওবন্দে পড়ার সময় তিনি তাঁর নিকট থেকে সনদ নিয়েছিলেন (ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২০, টীকা-১)।*
১১. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ১৯-২০। গৃহীত: খোদনবিশ্‌ত সাওয়ানিহে হায়াত, পৃঃ ৭৫; আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪২; নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৩৯-৪০।*

বলব, আমি মাওলানা ছানাউল্লাহকে মুহাদ্দিছ বানিয়েছি। সে আমার নিকট থেকে ইলম হাছিল করে সমগ্র দেশে ইলমে হাদীছের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।[১২] হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী এটাই তো উপকারী ইলম, মৃত্যুর পরেও যার ছওয়াব জারী থাকে।[১৩]

মেধাবীর প্রতি হিংসা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক শায়খুল হাদীছ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর (১৮৫১-১৯৩০) নিকট প্রত্যেকটি কিতাব পড়ার সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ক্লাসে নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করতেন। উসতাদকে ঠেকানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অধিক জ্ঞান হাছিল ও বিষয়ের গভীরে পৌঁছার জন্যই তিনি তা করতেন। বেশী প্রশ্ন করার কারণে মাওলানা ছাহেব বিরক্ত হতেন না। বরং মমত্বপূর্ণ ভাষায় হাসিমুখে তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করতেন। এতে অমৃতসরীর পেছনে তাঁর অনেক সময় ব্যয় হত। দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি তাঁর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে যান। দুপুর ১১-১২টার মাঝামাঝি সময়। মাওলানা মাহমূদুল হাসান তখন তাঁর মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একাকী বসা ছিলেন। তিনি অমৃতসরীকে বিদায় দেয়ার সময় বলেন, 'তোমার অনেক সহপাঠী তোমার বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ করত যে, তুমি প্রশ্ন করে অনেক সময় নষ্ট করে দাও। আমি বলতাম, কোন ছাত্র প্রশ্ন করতে চাইলে করুক। তার প্রশ্নগুলো ঠিক হোক বা বেঠিক কিছু তো জিজ্ঞাসা করুক। তোমারও খুশী হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ কাউকে কিছু দিলে মানুষেরা সে বিষয়ে তার প্রতি হিংসা করে'। একথা শুনে অমৃতসরীর দু'চোক্ষ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি জীবনে কোনদিন এই ঘটনা ভুলেননি। বরং যখন সমকালীন ব্যক্তিদের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন তখন উসতাদে মুহতারামের এই বাণী চিরন্তন তাঁর সকল মনোবেদনা দূর করে দিয়েছে। এই ঘটনাটি যখনই তাঁর মনে পড়ত তখনই তিনি এই কবিতাটি আওড়াতেন,

هُمْ يَحْسُدُوْنِيْ وَشَرُّ النَّاسِ كُلِّهِمْ
مَنْ عَاشَ فِي النَّاسِ يَوْمًا غَيْرَ مَحْسُوْدِ-

'তারা আমার প্রতি হিংসা করে। অথচ তারা সবাই নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ। এমন কে আছে যে হিংসার শিকার হওয়া ছাড়া একদিন মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে পারে'।[১৪] এইসব হিংসুকদের থেকে ইমাম বুখারীও (রহঃ) রক্ষা পাননি। এজন্যই বলা হয়, هَلْ مَاتَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلاَّ مَحْسُوْدًا 'ইমাম বুখারী (রহঃ)ও কি মৃত্যুবরণ করেছেন হিংসার শিকার না হয়ে'?

শেষ পাঠশালা কানপুরের ফয়যে 'আম মাদরাসায় :

দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীছের সনদ লাভের পর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কানপুরের ফয়যে 'আম মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরীর মা'কূলাতে বিশেষ খ্যাতির কথা শুনে সেখানে ভর্তি হন। তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'দেওবন্দ থেকে মাদরাসা ফয়যে 'আম, কানপুরে যাই। কেননা সে সময় মাওলানা আহমাদ হাসান মরহূমের মানতিকের দরসের খ্যাতি অনেক বেশী ছিল আর আমারও মা'কূল ও মানকূলের ইলম সমূহের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। এজন্য মাদরাসা ফয়যে 'আম কানপুরে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাই। (কোন সন্দেহ নেই মাওলানার জ্ঞানের গভীরতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ছিল)। সেখানে গিয়ে আমি পূর্বে পঠিত গ্রন্থগুলোর ক্লাসে শরীক হই এবং পুনরাবৃত্তির স্বাদ আস্বাদন করি। (মাওলানা আহমাদ হাসান ব্রেলভী আক্বীদার মানুষ হলেও ছাত্রদের জন্য কোন মাযহাবী বাধ্যবাধকতা পছন্দ করতেন না)। ঐ সময় মাওলানার হাদীছ পড়ানোর টাটকা শখ হয়েছিল। আমি তাঁর হাদীছের দরসেও শরীক হই। (সেখানকার হাদীছের পাঠ তৃতীয় ঢংয়ের পাই। ফলকথা আমি ইলমে হাদীছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ফায়েদা লাভ করেছি। খালেছ আহলেহাদীছ, খালেছ হানাফী, ব্রেলভী আক্বীদা)। পাঞ্জাবে মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ছাহেব (আহলেহাদীছ মাসলাক) আমার শায়খুল হাদীছ ছিলেন। দেওবন্দে মাওলানা মাহমূদুল হাসান ছাহেব এবং কানপুরে মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) উসতাদুল উলূম ওয়াল হাদীছ আমার শায়খুল হাদীছ ছিলেন। এজন্য আমি হাদীছের তিনজন শিক্ষকের নিকট থেকে যে পাঠদান পদ্ধতি শিখেছি তা একটা আরেকটা থেকে একেবারেই ভিন্ন। যেটা এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। শা'বান ১৩১০ হিঃ মোতাবেক ১৮৯২ সালে ফয়যে 'আম কানপুরের জালসা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৮ জন ছাত্রকে পাগড়ী ও দাওরায়ে হাদীছের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। ঐ আটজনের একজন আমি অকিঞ্চনও ছিলাম'।[১৫]

উক্ত জালসায় মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরী তাঁকে যে সনদ প্রদান করেছিলেন তাতে লেখা ছিল, هذا الرجل الماهر الكامل، والعالم الفاضل، الذكى اللوذعى، اللهوف اليلمعى المولوي محمد ثناء الله قد غاص على فرائد اللآلى فى ذلك الِيمّ، وقد خاض لطلب فوائد الجواهر في ذلك الِخضمِّ. 'পূর্ণ অভিজ্ঞ, মর্যাদাবান আলেম, মেধাবী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মৌলভী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ মূল্যবান মুক্তা আহরণের জন্য (ইলমের) এই অথৈ সাগরে সন্তরণ করেছেন

---

১২. *পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৫/৮ সংখ্যা, ১৬-৩০শে এপ্রিল ২০১৫, পৃঃ ২৬।*
১৩. *মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।*
১৪. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২০-২১; দুর্রে মুখতার ১/৪৫। গৃহীত : আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৭ই নভেম্বর ১৯২৪।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ২১-২২। গৃহীত: খোদনবিশ্‌ত সাওয়ানিহে হায়াত, পৃঃ ৫৮; আহলেহাদীছ, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪২; নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪১।*

এবং ইলমী ফায়েদার মণি-মাণিক্য অনুসন্ধানে ডুব দিয়েছেন'।[১৬]

দাওরায়ে হাদীছের সনদের এরূপ ভাষা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর শিক্ষক মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরী তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও শ্রেষ্ঠত্বকে কিভাবে তেজস্বী ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, কানপুরের উক্ত জালসায় (১৩১০/১৮৯২) মাওলানা মুহাম্মাদ লুতফুল্লাহ আলিগড়ীর (মৃঃ ১৩৩৫ হিঃ) সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম তাহরীকে নাদওয়াতুল ওলামা (নাদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন) গঠিত হয় এবং মাওলানা অমৃতসরী উক্ত আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৭] সাইয়িদ সুলাইমান নাদভীর ভাষ্যমতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য ছিলেন।[১৮] এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ছাত্রজীবনেই অমৃতসরীর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

হেকিমী বিদ্যা অর্জন :

তদানীন্তন সময়ের আলেমদের মাঝে হেকিমী চিকিৎসা শেখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মাওলানা অমৃতসরীও কানপুরের ফয়যে 'আম মাদরাসায় অধ্যয়নকালে হেকিম ফযলুল্লাহ কানপুরীর নিকট এ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। তবে তিনি কখনো হেকিমীকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি।[১৯]

শিক্ষকতা :

দাওরা ফারেগ হওয়ার পরপরই তিনি শিক্ষকতার জীবনে পদার্পণ করেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'আমার প্রথম শিক্ষক মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) যখন আমার ফারেগ হওয়ার কথা জানতে পারেন তখন তিনি আমাকে স্নেহবশতঃ মাদরাসা তাঈদুল ইসলাম, অমৃতসরে প্রধান শিক্ষকের পদে ডেকে নেন। এখানে পৌঁছে আমি আরবী কিতাব সমূহ পড়াতে থাকি'।

প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা আহমাদুল্লাহ তাঈদুল ইসলাম মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে তাঁর ফারেগ হওয়ার পর সোজা কানপুর থেকে ডেকে নিয়ে এসে প্রধান শিক্ষকের পদে বসান। পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে ছাত্রদেরকে তিনি প্রথম ছহীহুল বুখারীর দরস প্রদান করেন। এর মাধ্যমে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি ছাত্রজীবনেই ইলমী যোগ্যতার কোন উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষকগণ তাঁকে কেমন সম্মানের চোখে দেখতেন।

যাহোক, তাঈদুল ইসলাম মাদরাসায় ৬ বছরের মতো পাঠদানের পর তিনি মালেরকোটলায়[২০] চলে যান। অমৃতসরী লিখেছেন, 'এরপর কিছুদিনের জন্য ১৮৯৮ সালে মালেরকোটলার মাদরাসা ইসলামিয়ায় প্রধান শিক্ষক পদে ডাকা হয়। অবশেষে ওখান থেকে আবার অমৃতসরে চলে আসি'।[২১]

জীবনীকার মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভীর বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তিন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে মালেরকোটলা থেকে চলে এসেছিলেন।[২২] উক্ত মাদরাসায় তিনি দু'বছর তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহের দরস প্রদান করেন। অতঃপর শিক্ষকতা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা, বাহাছ-মুনাযারা, লেখালেখি, পত্রিকা সম্পাদনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে সারা জীবন অতিবাহিত করেন।[২৩] 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ثم رجع إلى أمرتسر واشتغل بالتصنيف والتذكير والمناظرة. 'অতঃপর তিনি অমৃতসরে ফিরে আসেন এবং গ্রন্থ রচনা, বক্তৃতা ও মুনাযারায় নিয়োজিত থাকেন'।[২৪]

মৌলভী ফাযেল ডিগ্রী লাভ :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর যুগটা ছিল বাহাছ-মুনাযারার যুগ। তখন বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণ নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য পরস্পরের প্রতি মুনাযারার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেই থাকতেন। মুনাযারায় সরকারী সনদকে প্রতিদ্বন্দ্বীর ইলমী যোগ্যতার অনেক বড় মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সে সময় কোন আলেমের জন্য এটা অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। এর ফলে ইলমী ময়দানে অগ্রসর হওয়ার নতুন দ্বার উন্মোচিত হত। তখন প্রাচ্যবিদ্যায় 'মৌলভী ফাযেল' পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সেকারণ তিনি ১৯০২ সালে (১৩২০ হিঃ) কৃতিত্বের সাথে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে সনদ হাছিল করেন।[২৫] এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদার মুকুটে আরো একটি নতুন পালক যুক্ত হয়।

[চলবে]

---

১৬. *নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪২-এর বরাতে ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।*

১৭. *আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকেরায়ে আবুল অফা (গুজরানওয়ালা : নাদওয়াতুল মুহাদ্দিছীন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃঃ ১৯; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২২-২৩; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১২৩।*

১৮. *সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী, হায়াতে শিবলী (আযমগড় : দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী, নতুন সংস্করণ, ২০০৮), পৃঃ ২৫০-২৫১; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।*

১৯. *আহলেহাদীছ, ২৩শে অক্টোবর ১৯৪২-এর বরাতে ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২৩; তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ২০।*

২০. *মালেরকোটলা পূর্ব পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ঐ সময় এটি পাঞ্জাবের একটি মুসলিম রাজত্বের মর্যাদা লাভ করেছিল। দেশ বিভাগের পর তার এই মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে এটি লুধিয়ানা যেলার একটি শহর (বাযমে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৪৬-৪৭)।*

২১. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ২৩-২৪; মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী হায়াত খিদমাত আছার (শিয়ালকোট : জামে'আ রহমানিয়া, ১ম প্রকাশ, মে ২০১৬), পৃঃ ১৮।*

২২. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১২৮।*

২৩. *আব্দুর রশীদ ইরাকী, চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ (নয়া দিল্লী : ফরীদ বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ১৮১; আব্দুল খালেক নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।*

২৪. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*

২৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বাযমে আরজুমন্দাঁ (লাহোর : মাকতাবায়ে কুদ্দূসিয়া, ২০০৬), পৃঃ ১৪৭।*

উওয়াইস আল-কারানী (রহঃ)-এর মর্যাদা

মানুষ পৃথিবীতে আসে পিতা-মাতার মাধ্যমে। ফলে সন্তানের কাছে পিতামাতা অতি শ্রদ্ধার পাত্র এবং সদাচরণ পাওয়ার হকদার। আবার উভয়ের মধ্যে মায়ের সদাচরণ পাওয়ার অধিকার বেশী। পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। উওয়াইস আল-কারানী মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। মাতৃসেবার মাধ্যমে তিনি এতটাই মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সাথে কারো সাক্ষাৎ হ'লে তার নিকটে দো'আ চাইতে বলেছেন। নিম্নের হাদীছে উওয়াইস আল-কারানীর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।-

উসায়র ইবনু জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামানের কোন সাহায্যকারী দল তার নিকটে আসত, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মাঝে কি উওয়াইস ইবনু আমির রয়েছে? অবশেষে তিনি উওয়াইসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি উওয়াইস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা আরোগ্য হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা বেঁচে আছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের নিকটে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াইস ইবনু আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। পরে তা নিরাময় হয়ে যায়। কেবলমাত্র এক দিরহাম (পরিমাণ স্থান) ব্যতিরেকে। তার মা রয়েছেন। সে তার প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন লোক আল্লাহ্র উপর শপথ করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। সুতরাং তুমি যদি তোমার জন্য তাঁর নিকটে মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পাও তাহ'লে তা করবে'। কাজেই তুমি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ কর। তখন উওয়াইস (রহঃ) তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন।

অতঃপর ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কূফা অঞ্চলে। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কূফার গভর্ণরের নিকট চিঠি লিখে দিব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে অবস্থান করাই পসন্দ করি। রাবী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকেদের মাঝে এক লোক হজ্জ করতে আসল এবং ওমর (রাঃ)-এর সাথে তার দেখা হ'ল। তখন তিনি তাকে উওয়াইস কারানী (রহঃ)-এর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের নিকট কারান বংশের মুরাদ গোত্রের উওয়াইস ইবনু আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী সেনাদলের সাথে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করেছে, এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তার মা আছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। সে যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তার নিকট মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে।

পরে ঐ অভিজাত ব্যক্তি (হজ্জ থেকে ফিরে) উওয়াইস (রহঃ)-এর কাছে আসল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য প্রত্যাগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। উওয়াইস বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করলেন। তখন লোকেরা তার (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হ'ল। তারপর তিনি সম্মুখ দিকে চললেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। উসায়র (রাঃ) বলেন, আমি তাকে একটি ডোরাদার চাদর দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন ব্যক্তি তাকে দেখত, তখন জানতে চাইতো, উওয়াইসের নিকট এ চাদরটি কোথা থেকে আসল'? *(মুসলিম হা/৬৩৮৬-(২২৫), ২৫৪২)।*

শিক্ষা :

১. মায়ের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্র রিযামান্দী হাছিল করা যায়। ফলে আল্লাহও ঐ ব্যক্তির দো'আ কবুল করেন।

২. সৎকর্মপরায়ণ লোকের কাছে দো'আ চাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) অছিয়ত করেছেন।

৩. দেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাহচর্য থেকে দূরে থাকা সালাফে ছালেহীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম দরিদ্র মানুষের সাথে থাকতে ভালবাসতেন।

৫. মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তি বয়সে ছোট এবং পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের হ'লেও তার কাছে দো'আ চাওয়া যায়।

পরিশেষে বলব, আলোচ্য হাদীছে মাতৃসেবার ফযীলত ও মুত্তাক্বীদের নিকটে দো'আ চাওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদেরকেও মায়ের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অমর বাণী

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, اَلنَّاسُ إِلَى الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ، 'পানাহারের চেয়ে মানুষের ইলমের প্রয়োজন বেশী। কারণ দিনে একবার বা দুইবার মানুষের পানাহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সারা জীবন তার ইলমের প্রয়োজন পড়ে'।[১]

২. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُحِبَّ اللهَ حَتَّى تُحِبَّ طَاعَتَهُ، 'জেনে রেখ, আল্লাহ্র আনুগত্য তোমার কাছে পসন্দনীয় না হওয়া পর্যন্ত তুমি সত্যিকারার্থে তাঁকে ভালবাসতে পারবে না'।[২]

৩. ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) অল্পে তুষ্টির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন, لَوْ عَلِمَ الْمُلُوْكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ لَذِيْذِ الْعَيْشِ، لَجَالَدُوْنَا عَلَيْهِ بِالسُّيُوْفِ، 'যদি রাজা-বাদশাহ এবং রাজকুমাররা জানত যে, (অল্পে তুষ্টির কারণে) আমরা কত সুখ-শান্তির জীবন যাপন করছি, তাহ'লে তারা তা অর্জনের জন্য তরবারী নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ত'।[৩]

৪. আলী বিন আবু ত্বালেব (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللهَ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللهَ، 'তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, বরং ইলম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মাঝে কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ্র ইবাদত করে মানুষের কাছে গর্ব প্রকাশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। তুমি যদি কোন সৎ কাজ করতে পার, তাহ'লে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। আর যদি কোন পাপ করে ফেল, তাহ'লে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[৪]

৫. জনৈক ছাহাবী বলেন, كُنَّا نَدَعُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الْحَلَالِ؛ مَخَافَةَ أَنْ نَقَعَ فِي بَابٍ مِنَ الْحَرَامِ، 'আমরা হারামের কোন একটি দরজায় প্রবেশ করার আশঙ্কায় সত্তরটি হালালের দরজা বন্ধ করে দিতাম'।[৫]

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِنَّ الإِحْسَانَ يَفْرَحُ الْقَلْبَ وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيَجْلُبُ النِّعَمَ وَيَدْفَعُ النِّقَمَ، وَتَرْكُهُ يُوْجِبُ الضَّيْمَ والضِّيْقَ، وَيَمْنَعُ وُصُوْلَ النِّعَمِ إِلَيْهِ، فَالْجُبْنُ : تَرْكُ الْإِحْسَانِ بِالْبَدَنِ، وَالْبُخْلُ: تَرْكُ الْإِحْسَانِ بِالْمَالِ، 'পরোপকার করলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, মন উদার হয়। এটি আল্লাহ্র নে'মতকে টেনে নিয়ে আসে এবং তাঁর শাস্তিকে ঠেকিয়ে দেয়। আর পরোপকার না করলে জীবনের অনিষ্টতা ও সংকট অবধারিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র নে'মত লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কাপুরুষতা হ'ল দৈহিক শক্তি দিয়ে কাউকে উপকার না করা এবং কৃপণতা হ'ল অর্থ দিয়ে কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা'।[৬]

৭. আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ (রহঃ) বলেন, كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا يَأْمُرُهُ فِي رِفْقٍ، فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَإِنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ يَخْرِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ وَيَهْتِكُ سِتْرَهُ، 'তোমাদের পূর্বসূরীরা কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখলে নম্রতার সাথে তা ধরিয়ে দিতেন। ফলে আদেশ-নিষেধের বিনিময়ে তিনি ছওয়াব অর্জন করতেন। আর এখন তো মানুষ তার ভাইয়ের সম্মানহানী করে, তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং পরস্পরের গোপনীয়তা ছিন্ন করে'।[৭]

৮. ইয়াহ্ইয়া বিন মু'আয (রহঃ) বলেন, اَلدُّنْيَا خَمْرُ الشَّيْطَانِ، مَنْ سَكِرَ مِنْهَا لَمْ يُفِقْ إِلاَّ فِي عَسْكَرِ الْمَوْتَى نَادِماً مَعَ الْخَاسِرِيْنَ 'দুনিয়া হ'ল শয়তানের মাদক। যে ব্যক্তি এই মাদকে আসক্ত হবে, সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে মৃতদের দলভুক্ত হওয়া ছাড়া হুঁশ ফিরে পাবে না'।[৮]

৯. ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَرَدَّ غَضَبَهُ أَخْزَى شَيْطَانَهُ وَسَلِمَتْ مُرُوءَتُهُ وَدِينُهُ 'যে ব্যক্তি রাগ সংবরণ করে এবং ক্রোধ চেপে রাখে, সে শয়তানকে লাঞ্ছিত করে। এর ফলে তার মানবিকতা ও দ্বীনদারীও হেফাযতে থাকে'।[৯]

১০. আমর ইবনুল আহতাম (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ الرِّجَالِ أَشْجَعُ؟ 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে'? তিনি বললেন, مَنْ رَدَّ جَهْلَهُ بِحِلْمِهِ 'যে সহনশীলতার মাধ্যমে তার মূর্খতাকে দূরীভূত করতে পারে (সেই সবচেয়ে

---

* এম.এ শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/৪৪০।
২. ইবনু রজব জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২১।
৩. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বির, পৃঃ ৪৫৭।
৪. হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫।
৫. মাদারিজুস সালিকীন ২/২৫।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, ত্বরীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ ৪৬০।
৭. জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫।
৮. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ৪/৬৭।
৯. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৭/২৫০।

বড় বীর)'। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হ'ল, فَأَيُّ الرِّجَالِ أَسْخَى؟ 'মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় দানবীর কে'? তিনি বললেন, مَنْ بَذَلَ دُنْيَاهُ لِصَالِحِ دِيْنِهِ، 'যে ব্যক্তি তার দ্বীনের কল্যাণের জন্য দুনিয়াবী স্বার্থ পরিত্যাগ করে (সেই বড় দানবীর)'।[১০]

১১. আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, اَلْبَشَاشَةُ إِدَامُ الْعُلَمَاءِ، وَسَجِيَّةُ الْحُكَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْبِشْرَ يُطْفِئُ نَارَ الْمُعَانَدَةِ، وَيُحَرِّقُ هَيْجَانَ الْمُبَاغَضَةِ، وَفِيْهِ تَحْصِيْنٌ مِنَ الْبَاغِي، وَمَنْجَاةٌ مِنَ السَّاعِي– 'হাস্যোজ্জ্বল চেহারা হ'ল আলেমদের ঋদ্ধ বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞানীদের সৎ স্বভাব। কেননা প্রফুল্লতা অবাধ্যতার আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় এবং হিংসা-বিদ্বেষের উত্তেজনাকে প্রশমিত করে দেয়। এতে রয়েছে অত্যাচারী থেকে বাঁচার নিরাপত্তা এবং কুৎসা রটনাকারী থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়'।[১১]

১২. মাকহূল আশ-শামী (রহঃ) বলেন, مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَكَّرَ فِيمَا صَنَعَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ خَيْرًا، يَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ عَمِلَ ذَنْبًا اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ، وَرَجَعَ عَنْ قَرِيبٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، كَانَ كَمَثَلِ التَّاجِرِ الَّذِي يُنْفِقُ، وَلَا يَحْسِبُ حَتَّى يُفْلِسَ وَلَا يَشْعُرَ 'যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করবে তার উচিত হ'ল সারা দিনের কার্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। যদি সে ঐদিন কোন সৎ কাজ করে থাকে, তাহ'লে সেজন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। আর যদি কোন পাপ কাজ করে থাকে, তাহ'লে সেই পাপের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং অতিসত্বর তা পরিত্যাগ করবে। যদি সে এভাবে ঘুমানোর সময় চিন্তা-ভাবনা না করে, তাহ'লে তার উপমা হ'ল ঐ ব্যবসায়ীর মত, যে দেদারসে খরচ করে এবং নিজের অজান্তেই নিঃস্ব হয়ে যায়'।[১২]

১৩. ক্বাসেম ইবনু ওছমান আল-যু'ঈ (রহঃ) বলেন, أَصْلُ الدِّيْنِ الْوَرْعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ، 'দ্বীনের মূল ভিত্তি হ'ল পরহেযগারিতা। সর্বোত্তম ইবাদত হ'ল রাতে কষ্ট স্বীকার করে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা। আর জান্নাতের সর্বোত্তম পথ হ'ল অন্তরের পরিশুদ্ধিতা'।[১৩]

১৪. কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, لَا تَتَفَكَّرْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لَا تَتَفَكَّرْ فِي الْفَقْرِ فَيَكْثُرَ هَمُّكَ وَغَمُّكَ، وَيَزِيْدَ فِيْ حِرْصِكَ، وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكَ فَيَغْلُظَ قَلْبُكَ، وَيَكْثُرَ حِقْدُكَ، وَيَدُومَ غَيْظُكَ، وَلَا تَتَفَكَّرْ فِي طُولِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، فَتُحِبَّ الْجَمْعَ، وَتُضَيِّعَ الْعُمْرَ، وَتُسَوِّفَ فِي الْعَمَلِ 'তিনটি বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করবে না। (১) অভাব-অনটন নিয়ে চিন্তা করবে না। এতে তোমার উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যাবে এবং তোমার লোভ-লালসাও বৃদ্ধি পাবে। (২) কে তোমার প্রতি যুলুম করেছে, তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবে না, নচেৎ তোমার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে এবং তোমার অন্তরে ক্রোধ স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে'। (৩) দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করবে না, তাহ'লে সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি তুমি আগ্রহী হয়ে উঠবে, জীবনের সময়গুলো নষ্ট করবে এবং সৎ আমল সম্পাদনে গড়িমসি করতে থাকবে'।[১৪]

১০. *গাযালী, এহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৭৮।*
১১. *ইবনু হিব্বান, রওযাতুল উক্বালা, পৃঃ ৭৫।*
১২. *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃঃ ৫৭২।*
১৩. *ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৩৮৯।*
১৪. *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃঃ ৫৭২।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

আল-'আওন
টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য

০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য

০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত

আল-'আওন (স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা) রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

গ্রীষ্মকালীন ফল-ফলাদির নানাবিধ পুষ্টিগুণ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার জন্য যেসব নে'মতের ব্যবস্থা করেছেন তন্মধ্যে ফল-ফলাদি অন্যতম। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারা বছর কোন না কোন ফলের সমারোহ থাকলেও জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস আসে নানা প্রজাতির রসালো ফলের সুবাস নিয়ে। ষড়ঋতুর এদেশে গ্রীষ্মকালের তীব্র তাপদাহের সময় এসব ফল মানুষকে স্বস্তি দেয়। বাযারে ফলের দোকানে, রাস্তার ধারে থরে থরে সাজানো থাকে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কালোজাম, বাঙ্গিসহ নানা রকম রসালো ফল।

এসব রসাল ফল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এগুলো পানি, খাদ্য-আঁশ ও প্রাকৃতিক চিনিরও উৎস। সব মিলিয়ে এই ফলগুলো শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও বেশ সহায়ক। কাজেই করোনা ভাইরাসের এই সংক্রমণের সময় প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কিছু মৌসুমী ফল অবশ্যই রাখুন। আসুন জেনে নেই এ সময়ে আসা ফলসমূহ শরীরের জন্য কি কি উপকার বয়ে আনে।

আম : আম কাঁচা-পাকা উভয় অবস্থাতেই শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। বরং পাকা আমের তুলনায় কাঁচা আমের পুষ্টিগুণই বেশী। যারা ওযন কমাতে চান, তাদের জন্য আদর্শ ফল কাঁচা আম। আমে বিদ্যমান ক্যারোটিনয়েডগুলো কোলন ও ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়, চোখ সুস্থ রাখে, সর্দি-কাশি দূর করে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করে। আমের পটাশিয়াম, খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুলো উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। পাকা আম রক্তে কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এক দিন পরপর দৈনিক শর্করার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আম খেতে পারেন।

জাম : কালো জামে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি ও কাশির প্রবণতা বাড়ে, জামে এটি দূর হয়। জামের ভিটামিন এ চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে। সঙ্গে স্নায়ুগুলোকে কর্মক্ষম রেখে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা বাড়ায়। এর মধ্যস্থিত অ্যান্থোসায়ানিন হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। পটাশিয়াম উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল কমিয়ে ত্বকের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। জামের খনিজ লবণ হাড়কে শক্তিশালী ও মযবূত করতে সাহায্য করে। শর্করা কম থাকায় এবং খাদ্য-আঁশের উপস্থিতির কারণে কালো জাম খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিনই কালো জাম খেতে পারেন। এছাড়া জামে কম পরিমাণে ক্যালোরী থাকে, যা ক্ষতিকর তো নয়ই বরং স্বাস্থ্যসম্মত। তাই যারা ওযন নিয়ে চিন্তায় আছেন এবং নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন, তাদের খাদ্য তালিকায় থাকতে পারে জাম।

কাঁঠাল : পৃথিবীতে যত রকমের ফল উৎপন্ন হয় তার মধ্যে আকারের দিক থেকে কাঁঠাল সবচেয়ে বড়। কাঁঠাল নানা গুণে গুণান্বিত এবং বহুবিধ ব্যবহারে অন্য কোন ফল এর সমকক্ষ নেই। এটি একটি উচ্চ ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ফল, যাতে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন সি, বি ও পটাশিয়াম যেমন আছে। তেমনি ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বিশেষ করে কাঁঠালের বীজ পুষ্টিমানের দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ এবং সবজি হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমনকি কাঁঠালের ফেলে দেয়া অংশও উন্নতমানের পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্যস্থিত উপদানের কারণে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা চোখ ভালো রাখে, দাঁতের মাড়ি শক্তিশালী করে, উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এর ভিটামিন সি সর্দি-কাশি প্রতিহত করে, খাদ্য-আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

লিচু : মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদের রসাল ফল লিচুতে রয়েছে শর্করা, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি। এছাড়া এই ফলে বিদ্যমান বি ভিটামিনগুলো বিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করতেও পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লিচুর খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো রোগপ্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আনারস : আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান। যেগুলো শরীরের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এতে রয়েছে প্রচুর ক্যালরি, যা আমাদের শক্তি জোগায়। আনারস গলা ব্যথা, সাইনোসাইটিসজাতীয় অসুখগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে, হজমে সাহায্য করে, দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, ক্ষুধাবর্ধক হিসাবে কাজ করে এবং রক্ত পরিষ্কার করে হৃৎপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এই ফল। ফলে শিরা-ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হ'তে পারে। ফলে রক্ত শোধনে এই ফল ভূমিকা রাখে।

বাঙ্গি : বাঙ্গিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি এবং সি বিদ্যমান। এটি চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, ত্বক ভালো রাখে, চুল পড়া প্রতিরোধ করে, হজমে সাহায্য করে, রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে, অ্যাসিডিটি, আলসার, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামন্দ্যা, হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করে। কোলস্টেরল মুক্ত। তাই বাঙ্গি খেলে মুটিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। এতে চিনির পরিমাণ খুব কম। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও বাঙ্গি যথেষ্ট উপকারী।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, এসব সুস্বাদু ফল যেমন মানুষের খাবারের চাহিদা মেটায়, তেমনি তা শরীরকে সুস্থ রাখতে, বিশেষত গ্রীষ্মকালীন এ সময়ে দেখা দেওয়া নানা রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। তাই মৌসুমী ফল-ফলাদি খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যত্নবান হ'তে হবে। সাথে সাথে বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার এসব অনুগ্রহের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

কুরবানী

ডাঃ আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

পশুর গলে চালিয়ে অসি
ঝরায় যে খুন ভুবন পরে,
তাঁর নিমিত্তে এই ইবাদত
দেন যিনি জীবন সবার তরে।
অহি-র আলোয় জীবন গড়ে
দেয় যদি কেউ কুরবানী,
দুনিয়ার মাঝে তার চেয়ে গো
কে হবে বল সম্মানী?
প্রতিহিংসার মুখোশটারে
চরণ দিয়ে ছিন্ন কর,
ভালবাসার মালা দিয়ে
বিলাও জীবন আপন পর।
গোশত ভোজের নয়তো উৎসব
আসলে এটা স্মরণ তাঁর,
কেউ কি কভু দুনিয়া জুড়ে
এই নীতিতে হয় বিভোর?
নীতিহীন ঐ নেতার হাতে
যিম্মী হ'ল জনগণ,
তার হাতে ঐ কুরবানীটা
হয় যে বড় বেমানান।
এটা কুরবানী নয় অর্থ দিয়ে
ক্রয় পশুর আস্ফালন,
আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ বিধান
এর মাঝে হয় সঞ্চারণ।
কুরবানীতো অহি-র বিধান
সব বিধানের গোর কাফন,
আয়রে সবে ঝাণ্ডা উড়াই
শিরক-বিদ'আতের হোক মরণ॥

করোনা ভাইরাস

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বিশ্ব জুড়ে চরম আতঙ্ক আজ
করোনা ভাইরাস
অহি-র বিধান বলছে এসব
পাপকর্মের বহিঃপ্রকাশ।
মহান আল্লাহ পরীক্ষা করেন
ভয় ক্ষুধা ধন প্রাণ বিনাশে
অবাধ্য বান্দারা আবার যেন
সৎপথে ফিরে আসে।
তাঁরই সতর্ক বার্তা
প্রাণঘাতী এই মহারোগ
ছিন্ন করতে হবে আমল-আক্বীদা থেকে
শিরক-বিদ'আতের যোগাযোগ।
রোগ-বালা আল্লাহ্র সৃষ্টি
মুমিন কভু করে না ভয়
তাওয়াক্কুল আর তাক্বদীরে
বিশ্বাস সদা রাখে নিশ্চয়।
'করোনা' কোন আতঙ্ক নয়
শুধু একটি রোগের নাম
বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার কর
মুছীবত থেকে হ'তে সফলকাম।

আতঙ্কের নাম করোনা

ইউসুফ ইমাম, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

ওরে বাংলার মানুষ আর আস্ফালন কর না
এসেছে দেশে মহামারী নাম তার 'করোনা'।
নভেল করোনা বা কভিড উনিশের ভয়াল গ্রাসে
মানবদেহ যাচ্ছে থেমে পরিণত হচ্ছে লাশে।
দিনে দিনে বাড়ছে রোগী বাড়ছে মৃতের অঙ্ক
অসচেতন মানুষের জন্য আরও বাড়ছে আতঙ্ক।
স্বাস্থ্যবিধি সবগুলো আমরা সবাই মানি
নিয়মিত হাত ধুই ব্যবহার করি সাবান পানি।
টিস্যু বা হাত দিয়ে প্রতিহত করব হাঁচি-কাশি
অকারণে ঘরের বাইরে আমরা যেন না আসি।
অযথা হাত দেব না চোখে মুখে নাকে
গুজবে কান দিয়ে মোরা পড়ব না বিপাকে।
সচেতনতা নিয়ে আমরা করব না গোঁড়ামি
মনে রাখব নিজের ও অন্যের জীবন সমান দামি।
এই বিপদে দেখাব সহানুভূতি একে অপরের প্রতি
করব দো'আ 'করোনা' যেন করে না কারো ক্ষতি।

টাকায় কেনা হজ্জ

খোরশেদ আলম, মহাখালী, ঢাকা।

হজ্জ করে নামের আগে আলহাজ্জ লিখে নিত্য,
লিখতে যদি ভুল করে কেউ বাঁধায় করুণ কৃত্য।
বলে আমার এত টাকা খরচ হ'ল হজ্জে,
এখন কি আর নামের আগে আলহাজ্জ বিনে সাজে?
ছাহাবীদের নামের আগে আলহাজ্জ কেন নেই
তুমি হাজী, তোমার কাছে প্রশ্ন আমার এই?
আমার গাঁয়ে অনেক হাজী গড়াগড়ি খায়,
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অনেকে মসজিদে না যায়।
জর্দা-গুল, বিড়ি-তামাক ছাড়েনি অনেকে,
মিথ্যা নয়, সত্য এটা জানে বহু লোকে।
টাকা কামাই হয় যদি হাজীর একমাত্র নেশা,
এ হাজীর নাজাত লাভের পূর্ণ হবে না আশা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা মুলক।
২. গিরিশচন্দ্র সেন।
৩. ফুরক্বান, হুদা ও কিতাব।
৪. হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরা বা আয়াত, তা মক্কায় অবতীর্ণ হ'লেও।
৫. ১৫টি।
৬. সূরা হজ্জে।
৭. সূরা ফাতিহা (ভূমিকা; সেটাও কুরআনের অংশ)।
৮. সূরা বাক্বারাহ।
৯. সূরা ফাতিহা।
১০. সূরা বাক্বারাহ-এর ২৮২ নং আয়াত।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূর্য রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করা।
২. অগ্নাশয়।
৩. রেটিনা।
৪. ডায়াবেটিস।
৫. ইস্টজেন।
৬. পিটুইটারি।
৭. গলায় ল্যারিংসের উপরে, দু'পাশে।
৮. সিকামে।
৯. ভিলাস।
১০. বৃহদন্তে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. মর্যাদায় কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি?
২. আকারে কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?
৩. আকারে কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত কোনটি?
৪. কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা কোনটি?
৫. কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?
৬. কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা কোনটি?
৭. কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?
৮. কুরআনের মোট ১১৪টি সূরায় কতবার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' আছে?
৯. কোন সূরায় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' নেই?
১০. কোন সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' আছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. রক্তে হিমোগ্লোবিন-এর কাজ কি?
২. শ্রবণ ছাড়া কানের অন্যতম কাজ কি?
৩. মানবদেহ গঠনে কিসের প্রয়োজন বেশী?
৪. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে কি পরিমাণ রক্ত থাকে?
৫. মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থির নাম কি?
৬. রক্তে হিমোগ্লোবিনকে সাহায্য করে কে?
৭. মানুষের মেরুদণ্ডে কয়টি অস্থি আছে?
৮. মানবদেহে রাসায়নিক দূত হিসাবে কাজ করে কোনটি?
৯. কোন গ্রুপ সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে?
১০. মানবদেহে খণিজ লবণের পরিমাণ কত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

খোর্দ্দবাগবাড় ডাঙ্গাপাড়া, বদরগঞ্জ, দিনাজপুর ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বদরগঞ্জ থানাধীন খোর্দ্দবাগবাড় ডাঙ্গাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে লাবীব আল-হাসান।

আল্লাহ্‌র দীদার

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বিদ'আতী আমলে যায় না পাওয়া
মহান আল্লাহ্‌র দীদার,
শিরকী আমলে কাটে না কখনো
সমাজের কালো আঁধার।
জান্নাত পাওয়ার অসীলা তোমার
কেমনে হয় দেশের পীর?
রোগ মুক্তির দাওয়াই হয় কি করে
পীর-মাযারের তবারকের ক্ষীর?
পীর ধরে কেউ পার হ'তে পারবে না
কঠিন পুলছিরাত,
রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ছাড়া
পাবে না কেউ নাজাত।
পেতে হ'লে জান্নাত রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা ধর
পীর-মাযার, জ্যোতিষ-গণক সবকিছুই ছাড়।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৯ ও ৩০তম পারা)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আন'আম (৭৪-৭৯) আয়াত।
(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
৫. সাধারণ জ্ঞান :
(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা ইংরেজী (১-৩৪ নং প্রশ্ন), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) ও রহস্য (১-২১ নং প্রশ্ন)।
(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩; উদ্ভিদ জগৎ ২১-৩৯; শিশু অধিকার ৭-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক (১-৩৯ নং প্রশ্ন) এবং চড়ুবস হ'ল কবিতা।
৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।
৭. আযান : ***(শুধু বালকদের জন্য)***।
৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা।
৯. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : এমসিকিউ পদ্ধতিতে **(পরিচালকগণের জন্য)**
(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।
(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর **১. সম্পাদকীয় :** শিশুর ইসলামী শিক্ষা ২১তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৭; ছবর ২৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল'১৮; অন্ধকার থেকে আলোর পথে ২৯তম সংখ্যা মে-জুন'১৮; ছোটদের স্নেহ করো, ৪০তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল'২০; সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো ৪১তম সংখ্যা, মে-জুন'২০। **২. প্রবন্ধ :** শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার, ২৬-৩১তম সংখ্যা; আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা, ৩৬-৪০তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২ ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (৪র্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে প্রতিযোগীকে কলম সঙ্গে আনতে হবে।
৮. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৯. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।
১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১১. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৪. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৫. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৬. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. **শাখা**	: ৯ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. **উপযেলা**	: ১৬ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. **যেলা**	: ২৩শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. **কেন্দ্রীয় কার্যালয়**	: ১২ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

স্বদেশ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাযার কোটি টাকার বাজেট পেশ

২০২০-২১ অর্থবছরের ৫ লাখ ৬৮ হাযার কোটি টাকার বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। গত ১১ই জুন বেলা ৩টায় সংসদের বিশেষ বাজেট অধিবেশনে ৫২ মিনিট ব্যাপী ১১০ পৃষ্ঠার বাজেট বক্তব্য প্রদান করেন।

৫ লাখ ৬৮ হাযার কোটি টাকার বাজেট যা জিডিপির ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ। নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপির আকার ধরা হয়েছে ৩১ লাখ ৭১ হাযার ৮০০ কোটি টাকা। জিডিপি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ দশমিক ২ শতাংশ। বাজেট ব্যয়ের জন্য মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮২ হাযার ১৬ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাযার ৯৮৪ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫ হাযার ১৪৫ কোটি টাকা। সরকারের পরিচালনা ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪৮ হাযার ১৮০ কোটি টাকা। এরমধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় হবে ৬৪ হাযার কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের ১১.২৩ শতাংশ।

এবারের বাজেটে দাম কমতে পারে মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, ওষুধ, ডেইরী, মৎসশিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ, স্বর্ণ, অটোমোবাইল, ফ্রিজ, এসি, এলপিজি গ্যাস ইত্যাদি। আর দাম বাড়তে পারে চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া, প্রসাধনসামগ্রী, ফার্নিচার, মোবাইল খরচ, কার ও জীপ পরিচালন ব্যয়, সিরামিকের টয়লেট সামগ্রী, রঙ, অনলাইন খাবার ও কেনাকাটা, সিগারেট, স্টিল, আলোকসজ্জা সামগ্রী, অ্যালকোহল, ইন্টারনেট খরচ ইত্যাদি।

জাতীয় সংসদের ব্যতিক্রমধর্মী বাজেট বক্তব্য পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী

এবারের বাজেট উপস্থাপনকালে সংসদের পরিবেশে যেমন ভিন্নতা ছিল তেমনি বাজেট বক্তৃতায়ও ছিল নতুনত্ব। করোনার কারণে বাজেট বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে ৫২ মিনিটে শেষ করা হয়। অধিকাংশ বক্তব্য পঠিত বলে গণ্য করা হয়। আর অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার একটি বড় অংশ উপস্থাপিত হয় ডিজিটাল মাধ্যমে। এর বাইরে এবারের বাজেট বক্তৃতায় সুন্দর যে উদাহরণটি সৃষ্টি হয়েছে সেটা হ'ল পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি। এছাড়া অর্থমন্ত্রীর কণ্ঠে চলমান করোনা দুর্যোগ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত প্রার্থনার বিষয়টিও দৃষ্টি কেড়েছে সবার।

বাজেট বক্তৃতায় চলমান করোনা মহামারীকে অর্থমন্ত্রী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য কঠিন পরীক্ষা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এর সপক্ষে তিনি সূরা বাক্বারার ১৫৫ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও'। অতঃপর সূরা শরহ-এর ৫ নম্বর আয়াত উল্লেখ করে আশার বাণী শুনিয়েছেন মন্ত্রী। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে'। এছাড়া তিনি আরো কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করেন।

বাজেট বক্তৃতা শেষ করার আগে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অর্থমন্ত্রীর বিনীত প্রার্থনাও দৃষ্টি কেড়েছে। এসময় তিনি হাত তুলে বলেন, শেষ করার আগে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আমার বিনীত প্রার্থনা *'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছ'*। হে আমাদের প্রভু! তোমার রহমত থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। আমরা তোমার উপর ভরসা করি ও তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে আমাদের প্রভু! তুমি যদি রক্ষা না করো, তবে আমাদের রক্ষা করবে কে?

তিনি বাজেট বক্তৃতা শেষ করেছেন এভাবে- তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সালামুন 'আলাল মুরসালীন। ওয়ালহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। সবশেষে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে করোনার দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে একটি সুন্দর সকালের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তার স্মরণীয় বক্তৃতাটি সমাপ্ত করেন।

উল্লেখ্য, অর্থমন্ত্রী তার বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রায়ই কুরআনের উদ্ধৃতি দেন। এমনটি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রোগ্রামেও মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল প্রায়ই কুরআনের আলোচনায় চলে যান। বিশেষ করে দেশের অর্থনীতি স্বাবলম্বী করতে যাকাতের ব্যাপারে তিনি সব সময় জোর দিয়ে থাকেন।

করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতে দেশের আলেমগণ এটাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও পরীক্ষা হিসাবে আখ্যায়িত করলে কথিত অনেক সুশীল ব্যক্তি এর কড়া সমালোচনা করেন। এমনকি এমপি-মন্ত্রীদের মুখেও করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা, করোনার চেয়ে আমরা শক্তিশালী ইত্যাদি দাবী করতে দেখা যায়। তবে বৈশ্বিক অবস্থা যখন ভয়াবহ রূপ নেয় তখন তারা চুপসে যান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাকালে বিভিন্ন প্রোগ্রামে করোনার কাছে পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অসহায়ত্ব তুলে ধরেন। আল্লাহ্‌র এই আযাবের সামনে নিজেরা কতটা শক্তিহীন সেটা অকপটে স্বীকার করেন।

জাতীয় সংসদে মুনাজাত, করোনা মুক্তির ফরিয়াদ

জাতীয় সংসদে বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনা মহামারী থেকে মুক্তি পেতে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন জাতীয় সংসদ সদস্যরা। করোনাকে আযাব-গযব আখ্যা দিয়ে হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত পরিচালনা করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য হাফেয রুহুল আমীন মাদানী।

গত ১০ই জুন বুধবার বিকেলে একাদশ জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে ঢাকা-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবীবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে আলোচনা শেষে দো'আ করতে গিয়ে এভাবেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন তিনি। মুনাজাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রীসভার সদস্য, চীফ হুইপ, হুইপ, উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ অংশ নেন।

মুনাজাতে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আন্তরিকভাবে আপনার দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি, তওবা করছি। আমরা অতীতে যেসব খারাপ কাজ করেছিলাম, যার কারণে আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আমাদের ওপর মহামারী পাঠিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আন্তরিকতা নিয়ে আমরা তওবা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করে দিন। রাব্বুল 'আলামীন, আমরা

আপনার বান্দা। আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আযাব-গযব দিয়ে ধ্বংস করবেন না।

তিনি বলেন, আমরা আপনার প্রিয় নবীর উম্মত। আমাদের মাফ করে দিন। আমাদের ওপর থেকে গযব উঠিয়ে নিন। যারা করোনা ভাইরাসে মারা গেছে তাদের শহীদী মর্যাদা দান করুন। আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমরা আপনার করুণা চাই, গযবে আমাদের নিরাপত্তা দান করুন।

উল্লেখ্য, সংসদ অধিবেশনের শুরুর দিন শোক প্রস্তাবের পর মুনাজাতের রেওয়াজ রয়েছে। তবে এদিনের মুনাজাতটি ছিল ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। এসময় উপস্থিত সংসদ সদস্যদের কাতর হয়ে মুনাজাতে অংশ নিতে দেখা গেছে। সরকার প্রধানসহ অন্যরা কাতরকণ্ঠে 'আমীন' 'আমীন' বলেন। অনেককে এসময় কাঁদতেও দেখা যায়।

উল্লেখ্য, গত ১৮ই এপ্রিল অল্প সময়ের জন্য বসা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার এটিএম ফজলে রাব্বী মিয়াঁর নেতৃত্বে সংসদ সদস্যগণ প্রকাশ্যে তওবা করেন। আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচার আকুতি জানান।

করোনা সন্দেহে স্বামীকে বাড়িছাড়া করল স্ত্রী, আশ্রয় দিল পুলিশ

করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে বগুড়ার শেরপুর পলীতে বেলাল হোসাইন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ দিনমজুরকে ঘর থেকে বের করে দেয় স্ত্রী আনোয়ারা (৫৫)। এ সময় ঐ বৃদ্ধের ছেলে মেয়েরাও নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। গত ১৭ই জুন সন্ধ্যায় যখন জ্বরে কাতর বৃদ্ধকে নিজ বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় তখন বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এক প্রতিবেশীর ঘরের কার্ণিশে দাঁড়ালে সেখান থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সবার তাড়া খেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজেই মারা যাবেন। এরপর ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মৃত্যুর জন্য আলাহ্র দরবারে মুনাজাত শুরু করে দেন। লোক মারফত এ খবর পান শেরপুর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। ঐ রাতেই তিনি ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠান। পুলিশ বেলালকে উদ্ধার করে উপযেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

করোনায় এ পর্যন্ত চিকিৎসক আক্রান্ত ১০১১, মৃত ৫২

সারা দেশে এ পর্যন্ত ১ হাযার ১১ জন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৫২ জন চিকিৎসক করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। এছাড়া টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাযার ৩৩১ জন। এছাড়া ১ হাযার ১৬০ জন নার্স আক্রান্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে ১৭ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাযার ৫০২ জন। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) এবং বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন এসব তথ্য জানিয়েছে।

'লিভিং ঈগল' সাইফুল আজমের বিদায়

সাইফুল আজম, যিনি আকাশপথে যুদ্ধের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ইসরাঈলী বিমান ভূপাতিত করার রেকর্ডধারী। যিনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জর্ডান ও ইরাকের বিমানবাহিনীর বৈমানিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। যিনি বৈমানিক হিসাবে অসামান্য অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনী কর্তৃক বিশ্বের ২২ জন 'লিভিং ঈগলস'-এর একজন হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। লড়াকু এই আকাশ যোদ্ধা গত ১৪ই জুন ঢাকার সিএমএইচ-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

পাবনার অধিবাসী সাইফুল আজম ১৯৬০ সালে জেনারেল ডিউটি পাইলট হিসাবে যোগ দেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৬৩ সালে যোগ দেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকা কেন্দ্রে। এরপর তিনি প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান করাচীর মৌরিপুরের বিমান ঘাঁটিতে। এখানেই তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানকে প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তানের তৃতীয় সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা 'সিতারা-ই-জুরাত' এ ভূষিত হন। ১৯৬৬ সালে জর্ডানের বিমানবাহিনীতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে যান সাইফুল আজম। সেখানে তিনি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে তৃতীয় আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ইরাকী বিমানবাহিনীতে বদলী হন তিনি। এসময় তিনি ইসরাঈলী বিমানবাহিনীর কয়েকটি বিমান আক্রমণ ভণ্ডুল করে দেন এবং মাত্র ৭২ ঘন্টায় তিনটি ইসরাঈলী বিমান ভূপাতিত করেন। এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ জর্ডান থেকে সাইফুল আজমকে 'হুসাম-ই-ইস্তিকলাল' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

১৯৭১ সালে সাইফুল আজম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের শুরুতেই তাঁর ওপর পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে সাময়িকভাবে উড্ডয়ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। স্বাধীনতার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৭ সালে তাকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঢাকা ঘাঁটির অধিনায়ক করা হয়। পরবর্তীতে দু'বার তিনি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৯১-৯৬ সালে পাবনা-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ারভাইস মার্শাল ফখরুল আজম তার আপন ভাই।

বিদেশ

বন্দীদের জন্য ইতালীর সব কারাগারে মসজিদ!

ইতালী সরকার ও ইউনিয়ন অব ইসলামিক কমিটিজ অ্যান্ড অরগানাইজেশন ইন ইতালী (ইউসিওআইআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তির অধীনে ইমামরা এখন থেকে কারাগারের মুসলিম বন্দীদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া ও ছালাতের ইমামতি করার সুযোগ পাবেন।

কারা প্রশাসনের সাথে উক্ত সংগঠনের সভাপতি ইয়াসীন লাফরাম এ চুক্তি সম্পন্ন করেন। এর আগে দেশটির মসজিদ ও প্রার্থনা কক্ষগুলো খুলে দেওয়ার ব্যাপার ইতালীর প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোঁতে ও ঐ সংগঠনের প্রতিনিধি দলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইতালীর বিচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ইতালীর ৬০ হাযার বন্দীর মধ্যে ১০ হাযারই বিদেশী এবং ৭ হাযার ২০০ জন মুসলিম। বর্তমানে তাদের জন্য ৯৭ জন ধর্মীয় শিক্ষক রয়েছেন।

ইতালীর বিচার মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইতালীর সংবিধানে সব নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। এই চুক্তি তা প্রয়োগে সহায়তা করবে। চুক্তি অনুযায়ী ইউসিওআইআই ইতালীতে ইমামের দায়িত্ব পালনকারীদের একটি তালিকা দেবে, যারা সারা দেশের কারাগারের মুসলিম বন্দীদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দেবে এবং তাদের ছালাতে ইমামতি করবে।

সংগঠনের প্রধান লাফরাম বলেন, নতুন সমঝোতা চুক্তির আলোকে ইতালীর সব কারাগারে জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায় করা সম্ভব হবে। এটি মূলত পাঁচ বছর আগের একটি প্রজেক্টের সুফল, যার অধীনে ইতালীর আটটি কারাগারে এটি শুরু হয়েছিল।

হাযার হাযার মানুষকে করোনা থেকে রক্ষা করেছে মাস্ক

করোনার এপিসেন্টার হিসাবে পরিচিত দেশগুলোতে ফেস মাস্ক পরায় হাযার হাযার মানুষ প্রাণঘাতী ভাইরাসটি থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে একটি গবেষণায় বলা হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, করোনা প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব মানা এবং ঘরে থাকার চেয়েও কার্যকর হ'ল ফেস মাস্ক পরা। গবেষণাটি দ্য প্রসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সেস অব দ্য ইউএসএ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়, সংক্রমণের হারের নাটকীয় পরিবর্তন হয় যখন গত এপ্রিলের ৬ তারিখ ইতালীতে এবং ১৭ তারিখ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়।

গবেষকরা বলেন, মাস্ক পরায় করোনা সংক্রমণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছিল। মাস্ক পরার কারণে ইতালীতে এপ্রিলের ৬ থেকে ৯ই মে পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাযারের বেশী হ্রাস পায়। এছাড়া এপ্রিলের ১৭ তারিখ থেকে ৯ই মে পর্যন্ত নিউইয়র্ক শহরেও আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬৬ হাযারের বেশী হ্রাস পায়। গবেষণায় বলা হয়, মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার পর নিউইয়র্কে সংক্রমণের হার দৈনিক ৩ শতাংশ কমে যায়। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার আগে ইতালী এবং নিউইয়র্কে সামাজিক দূরত্ব, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন এবং সকল স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র মুখ ঢেকে রাখার কারণে বাতাসের মাধ্যমে ছড়ানো করোনা ভাইরাস থেকে হাযার হাযার মানুষ রক্ষা পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন গবেষকরা।

সর্বপ্রথম কোয়ারেন্টাইন উদ্ভাবন করেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)

-মার্কিন গবেষক ক্রেইগ কন্সিডাইন

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে কোয়ারেন্টাইন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এটি যেকোন উপায়ে মানতেই হবে। কিন্তু এই কোয়ারেন্টাইনের কথা সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন তিনি হ'লেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এমনটিই বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অবস্থিত রাইস ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. ক্রেইগ কন্সিডাইন।

এক প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় হোম কোয়ারেন্টাইন থাকতে বলেছেন। একই সঙ্গে সুস্থ লোকদের জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে, এসব উপায়ই করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

অতঃপর তিনি বলেন, আপনারা কি জানেন সর্বপ্রথম কে সবচেয়ে ভালো কোয়ারেন্টাইনের উদ্ভাবন করেছেন? আজ থেকে প্রায় ১৩শ' বছর আগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম কোয়ারেন্টাইনের ধারণা দেন। যদিও তাঁর সময়ে সংক্রামক রোগের কোন বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তারপরেও তিনি এসব রোগ-ব্যাধিতে তার অনুসারীদের যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা কভিড-১৯-এর মতো প্রাণঘাতী রোগ মোকাবেলায় মৌলিক পরামর্শ। তাঁর সেই পরামর্শ মানলেই করোনা সহ যেকোন মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

অতঃপর তিনি উদাহরণ হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর কয়েকটি বাণী উল্লেখ করেছেন। যেমন 'যখন তুমি কোন ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পাও, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। অন্যদিকে প্লেগ যদি তোমার অবস্থানস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহ'লে ঐ জায়গা ত্যাগ করো না'। 'সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রা সুস্থদের থেকে দূরে থাকবে'। 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক'। 'ঘুম থেকে ওঠার পরে হাত ধৌত করো' ইত্যাদি।

তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন অবদান রেখে অমর হয়ে আছেন। ঠিক তেমনই মানুষের জীবনযাপন বিষয়ক মহামূল্যবান যে পরামর্শ তিনি দিয়ে গেছেন তা আজও অনুকরণীয়।

৯ম দেশ হিসাবে করোনা থেকে মুক্তি পেয়েছে তানজানিয়া

করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পূর্ব আফ্রিকার দেশ তানজানিয়া। দেশটির খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট জন ম্যাগুফুলি এ ঘোষণা দেন। এক ভাষণে তিনি বলেন, এমন একটি দেশের নেতা হিসাবে এটা আমাকে উচ্ছ্বসিত করছে যে, আমরা সৃষ্টিকর্তাকে সবচেয়ে প্রাধান্য দেই, সৃষ্টিকর্তাও তানজানিয়াকে ভালোবাসেন।

তিনি বলেন, তানজানিয়ায় শয়তানের কর্মকাণ্ড সব সময়ই পরাজিত হয়েছে। কারণ এদেশের মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসেন। দেশটির জাম্বি টেলিভিশনে প্রচারিত ঐ ভাষণে ম্যাগুফুলি বলেন, 'তানজানিয়ার সব ধর্মের মানুষকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমরা সৃষ্টিকর্তার প্রতি উপবাস ও প্রার্থনা করেছি, যাতে তিনি আমাদের দেশ ও বিশ্বকে মহামারী থেকে মুক্তি দেন। সৃষ্টিকর্তা জবাব দিয়েছেন'। তিনি আরও বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি এবং আমি নিশ্চিত বহু তানজানিয়ান বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিকর্তা করোনা ভাইরাস নির্মূল করেছেন'।

উল্লেখ্য, করোনায় দেশটিতে ৫০৯ জন আক্রান্ত ও ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬১ শতাংশ খ্রিষ্টান ও ৩৫ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তানজানিয়ার জনগণ বহুদিন ধরেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহামারী থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে আসছে। তানজানিয়ার আগে করোনামুক্তির ঘোষণা দিয়েছে আরও ৮টি দেশ। এগুলো হ'ল- নিউজিল্যান্ড, মন্টেনিগ্রো, ইরিত্রিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি, সিসিলিস, হলি সি, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, ফিজি এবং পূর্ব তিমুর। এসব দেশে আর একজনও করোনা রোগী নেই।

মুসলিম জাহান

মারাত্মক ক্ষতিকারক পঙ্গপালকে যেভাবে উপকারে লাগাচ্ছে পাকিস্তান

পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে খাদ্যশস্য রক্ষায় এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে আগত পঙ্গপাল ঠেকাতে তাদেরকে এখন মুরগীর খাবার হিসাবে ব্যবহার করছে পাকিস্তানীরা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পাঞ্জাব প্রদেশে কৃষিতে একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু করেছেন। যেখানে পঙ্গপাল ঠেকাতে কাজে লাগানো হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ঐ প্রকল্প অনুযায়ী, পঙ্গপাল ধরে কেটে শুকিয়ে পোলট্রি ফিড হিসাবে জমা দিলেই প্রতি কেজি পঙ্গপাল সংগ্রহের জন্য ২০ রুপিয়া করে দেয়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের।

ভারত ও পাকিস্তান গত ২৫ বছরের মধ্যে এ বছর পঙ্গপালের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের কৃষিজমি অঞ্চলের ফসল ও কৃষকের আয় ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

পাকিস্তানের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মুহাম্মাদ খুরশিদ ও বায়োটেকনোলজিস্ট যোহর আলী যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামনের উদাহরণ অনুসরণ করে প্রকল্পটি চালু করেছেন। উল্লেখ্য, ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষ সে দেশের দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রোটিন-সমৃদ্ধ পঙ্গপাল খাওয়ার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করছে।

পঙ্গপালের আক্রমণে পুরো ফসল হারানো একজন কৃষক জানিয়েছেন, তিনি ও তার ছেলে এ পোকাটি ধরে এপর্যন্ত এক হাযার ৬০০ রুপি আয় করেছেন। ফলে ফসলের ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে যাচ্ছে।

মদীনার গবেষকরা করোনা চিকিৎসায় সফল!

কালোজিরা এবং চামেলি করোনা সংক্রমণ বন্ধ করে দিতে সক্ষম। সঊদী আরবের মদীনাস্থ তায়বাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দাবী করেছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সফলভাবে চিকিৎসা করেছেন তারা। এজন্য কালোজিরা ব্যবহার করা হয়েছে; যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো চিকিৎসা পদ্ধতি। এ ব্যাপারে গবেষক দলের একজন ডা. ছালেহ মুহাম্মাদ বলেন, আল্লাহ্র রহমতে, যেসব করোনা রোগীদের এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, তাদের সবাই সেরে উঠছে, তারা নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই পদ্ধতিতে রোগীদের সেরে উঠতে এক সপ্তাহের বেশী সময় লাগছে না। দেশটির তায়বাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ক্লিনিক্যাল বায়োক্যামিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার মেডিসিন বিভাগের গবেষকরা এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে মার্কিন জার্নাল 'পাবলিক হেলথ রিসার্চ'-এ।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য এই গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন- দুই গ্রাম কালোজিরা, এক গ্রাম চামেলি ফুল, এক চামচ মধু একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে খেতে হবে। এসব খাওয়ার পর জুস কিংবা একটি কমলা খাওয়া যেতে পারে। লেবু খেতে পারলে ভালো হয়। এভাবে প্রতিদিন একবার করে খেতে হবে। করোনামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে খেতে হবে।

গবেষকরা আরো বলছেন, রোগী আক্রান্ত হিসাবে শনাক্ত হ'লে প্রথম সপ্তাহে দিনে পাঁচবার এভাবে খেতে হবে। আর পরবর্তী সময়ে মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনে একবার করে খেতে হবে।

রোগীর যদি কাশি বেশী হয় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহ'লে কালোজিরা এবং লবঙ্গ মেশানো পানি গরম করে ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নিতে পারেন। কিংবা কালোজিরা ও চামেলি পানিতে গরম করেও বাষ্প টেনে নিতে পারেন।

গবেষকরা বলছেন, যদি অক্সিজেনের অভাব হয়, তাহ'লে এক চামচ কালোজিরা, এক চামচ চামেলি এবং এক কাপ পানি একটি পাত্রে নিয়ে হালকা গরম করতে হবে। এভাবে দিনে পাঁচ থেকে ছয়বার পানি গরম করে বাষ্প নাক দিয়ে টেনে নিতে হবে।

চলমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় ইসলামী অর্থনীতি : এরদোগান

তুরস্কের ঐতিহাসিক নগরী ইস্তাম্বুলকে ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল বানানোর ঘোষণা দিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান বলেন, চলমান উদ্ভূত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ইসলামী অর্থনীতি। বস্তুগত সম্পদের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সবার জন্য অসম নীতি তৈরি সম্ভব নয়। গত ১৪ই জুন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ১২তম আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতিবিষয়ক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন চোখ 'বায়োনিক আই' তৈরীর পথে হংকংয়ের গবেষকেরা

শক্তিশালী দৃষ্টি ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োনিক চোখ তৈরী করছেন হংকংয়ের গবেষকেরা। আগামী ৫ বছরের মধ্যেই এ চোখ ব্যবহার উপযোগী হবে। দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে দৃষ্টিক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল ডিভাইসটি।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিভাইসটি মানুষের চোখের আদলেই তৈরী করা হয়েছে। এজন্য কাঠামোগত যত নিখুঁত নকশা প্রয়োজন তা যুক্ত করেছেন গবেষকেরা। একে বিশ্বের প্রথম থ্রিডি আর্টিফিশিয়াল আইবল বলা হচ্ছে। ডিভাইসটি মানুষের চোখের কার্যক্ষমতার সব কাজকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে বলছেন গবেষকরা। হংকং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষকেরা বলছেন, পুরোপুরি বা আংশিক দৃষ্টিহীন সবার কাজে আসবে এটি।

'নেচার' সাময়িকীতে এ গবেষণা বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে বলা হয়, মানুষের চোখের মতোই কর্মক্ষম ডিভাইসটি উচ্চ রেজুলেশন ধারণ করতে পারে। এতে থাকা ক্ষুদ্র সেন্সর ছবিকে রূপান্তর করতে পারে, যা মানুষের চোখের আলোকসংবেদী কোষের অনুরূপ। এই সেন্সরগুলো অ্যালুমিনিয়াম এবং টাংস্টেন দিয়ে তৈরি একটি ঝিল্লির মধ্যে থাকে, যা মানুষের রেটিনা নকল করার উদ্দেশ্যে অর্ধ গোলকের আকারে তৈরী।

আগে এ ধরনের ডিভাইস তৈরী অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে হংকং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঝিয়ং ফ্যান বলেন, আগামী ৫ বছরে এ প্রযুক্তি বাস্তব ও প্রায়োগিক হবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ভিডিও কনফারেন্স

আহলেহাদীছ আন্দোলন, সিঙ্গাপুর শাখা

সিঙ্গাপুর ২১শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় (বাংলাদেশ সময়) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর শাখা সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে নওদাপাড়া মারকায থেকে সরাসরি বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করীম। উক্ত সম্মেলনে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন শাখা থেকে দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বক্তব্য শেষে আমীরে জামা'আত দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মতবিনিময় করেন।

ভোলা ২৪ শে জুন বুধবার : অদ্য বিকাল ৬-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভোলা যেলার উদ্যোগে এক ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভোলা যেলা আহ্বায়ক কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কনফারেন্সে নওদাপাড়া মারকায থেকে সরাসরি বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এসময় যেলার অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

হাটদামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী ৫ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাটদামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটদামনাশ এলাকার সাবেক সভাপতি মাস্টার মুহাম্মাদ ফয়েযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ' বাগমারা উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন সরদার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' বাগমারা উপযেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু রায়হান। এর আগে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ৭ই জুন রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে দুপুর ২-টা পর্যন্ত যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান। প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় করোনায় কর্মহীন মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ছালাতুল কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায়

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২১শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে 'ছালাতুল কুসূফ' বা সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, এই দিন ঢাকার আকাশে বেলা ১১-২৩ মিনিট থেকে ৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ চলে। আল-'আওন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থার সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের ইমামতিতে দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদাসহ সুন্নাতী পদ্ধতিতে দুই রাক'আত ছালাতুল কুসূফ আদায় করা হয়। উক্ত ছালাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় মুছল্লীগণ অংশগ্রহণ করেন। ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত খুৎবায় আমীরে জামা'আত উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এই ছালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ এই মুহূর্তে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় চলে এসেছে। এভাবে তিনটি মধ্যাকর্ষণ শক্তি একত্রিত হওয়ায় অন্য গ্রহ থেকে পাথর বা কোন মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সেকারণ এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করতেন। তিনি ছাহাবীদের নিয়ে দীর্ঘ ছালাতে রত থাকতেন এবং তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-ইস্তেগফার করতেন। আজ আমরাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই সুন্নাতের আমল করলাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন-আমীন!!

আল-'আওন

কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী ১১ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব থেকে রাত্রি সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে ব্লাড সংক্রান্ত বাস্তব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন। উক্ত প্রশিক্ষণে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ১২ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত সলপ ইউনিয়নে অবস্থিত রামগাছী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে সরকারী নিয়ম মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আল-'আওনের রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. জাহিদ ও অন্যান্যগণ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১২ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৫ই জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানার অন্তর্গত আরামবাগ নতুনপাড়ায় অবস্থিত 'যুবসংঘে'র অফিসে চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে চাঁপাই নবাবগঞ্জ আল-'আওনের কমিটি গঠন ও অফিস উদ্বোধন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি এমদাদুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ লতীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে

যেলা 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শ শেষে মুহাম্মাদ সুজন আলীকে সভাপতি ও রূহুল আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার ২০২০-২২ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন ও কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অত্র অনুষ্ঠানে ৩০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলে অংশগ্রহণ করেন।

মারকায সংবাদ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মারকাযের সাবেক ছাত্র আব্দুল্লাহিল কাফী-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক ছাত্র আব্দুল্লাহিল কাফী গত ৫ই এপ্রিল'২০ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ ও উছূলুদ্দীন অনুষদভুক্ত ইসলামী শিক্ষা বিভাগ থেকে সিজিপিএ ৪.৯৫ (মুমতায, মারতাবাতুশ শারাফ আল-উলা) পেয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম ছিল التحديات التي تواجه إكساب قِيم التربية الإسلامية لدى طلاب المدارس الإسلامية بشمال بنجلاديش مع تصور مقترح لمواجهتها (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় মাদরাসা সমূহের শিক্ষার্থীদের ইসলামী মূল্যবোধ অর্জনের পথে চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং তা প্রতিরোধে সম্ভাব্য প্রস্তাবনা)। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল হামীদ এবং পরীক্ষক ছিলেন সঊদী আরবের আবহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুবারক আশ-শাহরানী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল লতীফ আল-উরাইনী। ইতিপূর্বে তিনি একই বিভাগ থেকে ১৪৩৪-৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষে التربية الجسمية المستنبطة من الاحاديث الواردة في كتاب الطب من صحيح البخارى (ছহীহুল বুখারীর চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের আলোকে শারীরিক শিক্ষা) শিরোনামে এম.এস ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০০৫ সালে অত্র মারকায থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেছিলেন। তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার কানসাট ইউনিয়নের জায়গীর গ্রামের মাওলানা লুৎফর রহমানের একমাত্র পুত্র। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উপদেষ্টা ও আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, শাসনগাছা, কুমিল্লার ক্যাশিয়ার তোফাযযল হোসাইন (৭০) গত ২৩শে জুন মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১-টায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৪ কন্যা রেখে যান। উল্লেখ্য, ১৯শে জুন শুক্রবার মারকায মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায়ের পর বাসায় ফিরে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। তার প্রথম জানাযার ছালাত বিকাল ৩-টায় কুমিল্লা শহরের মধ্য আশরাফপুরে তার বাসার সামনে অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ জানাযায় ইমামতি করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার সেলিম, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হারেছ মিয়াঁ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হাবীবুর রহমান মাসঊদ, কোরপাই এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণ বেগ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জানাযায় যোগদান করেন। তাকে গোসল ও কাফন পরান মাওলানা মুছলেহুদ্দীন ও হারূণ বেগ। অতঃপর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তার পৈত্রিক বাড়ী যেলার বুড়িচং থানাধীন পারওয়ারা সংলগ্ন কুসুমপুর গ্রামে দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, জনাব তোফাযযল হোসাইন আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি গত বছরে আমীরে জামা'আতের লেখা শবেবরাত, মীলাদ প্রসঙ্গ ও আমীরে জামা'আতের পিতার লেখা কুরআন ও কালেমাখানি বই প্রত্যেকটি এক হাযার কপি করে ফ্রী বিতরণ করেন। সবশেষে মাসিক আত-তাহরীক মার্চ'২০ সংখ্যায় প্রকাশিত দরসে কুরআন 'আল্লাহকে দর্শন' বই আকারে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং এক হাযার কপি ফ্রী বিতরণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। শাসনগাছা কমপ্লেক্স সংস্কারেও তার অনেক অবদান ছিল। আমীরে জামা'আত তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করেন। তিনি সংগঠনের পক্ষ হ'তে তাঁর অন্তিম আকাংখা পূরণের আশ্বাস দেন এবং এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সাল থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি সঊদী আরবে প্রবাসী জীবন যাপন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ২০১২ সালে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সাথে পরিচিত হন এবং মারকাযে যাতায়াত শুরু করেন। তিনি 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত যেলার যেকোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করতেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

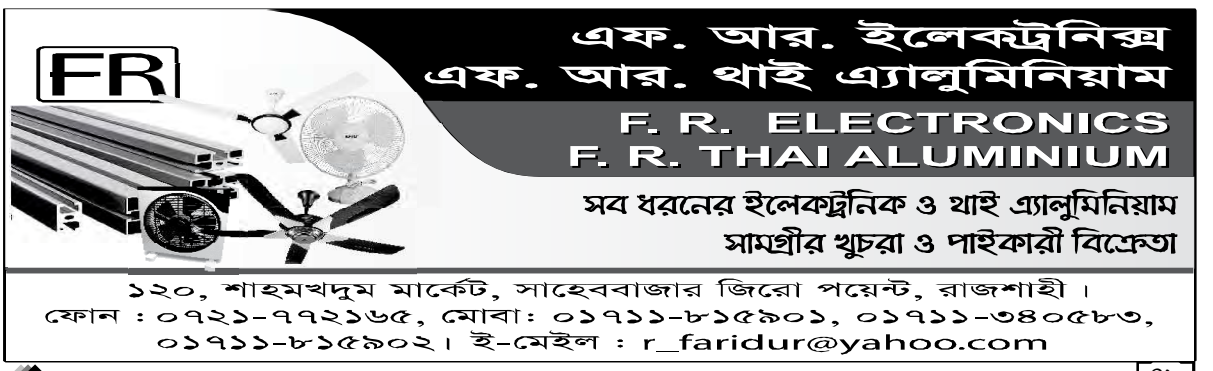

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : আমি অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী ছিলাম। কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কারণে বর্তমানে বড় আকারে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমি কি যাকাতের হকদার হব? যদি হই তবে যাকাতের টাকা দিয়ে সরাসরি ঋণ পরিশোধ না করে তা দিয়ে ব্যবসা করে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভোলা।

উত্তর : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাতের হকদার *(তওবা ৯/৬০)*। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হ'ল ঐ ব্যক্তি, যার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। তবে এমন অতিরিক্ত সম্পদ নেই যা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৩/৩২১)*। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের পর তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হ'ল ঋণ পরিশোধ করা। কেননা যেকোন সময় তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এমনকি কতিপয় বিদ্বান অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যেন ঋণ ব্যতীত অন্য খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে, সেজন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরাসরি যাকাত না দিয়ে তাকে জানিয়ে সরাসরি ঋণদাতাকে প্রদান করার কথা বলেছেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩১/১২৫)*। সুতরাং উক্ত অর্থ দিয়ে ব্যবসা করা যাবে না, যদিও তা ঋণ পরিশোধের নিয়তে হয়। তাছাড়া ব্যবসায় ক্ষতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে অপাত্রে যাকাতের অর্থ নিঃশেষ হ'লে সে পাপী এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪০৩-৪০৪; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : করোনার কারণে ময়দানে বা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা না গেলে বাড়িতে একাকী বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তা আদায় করা যাবে কি?

-বদীউয্যামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : বিশেষ কারণবশতঃ বাড়িতে একাকী বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অতিরিক্ত ১২ তাকবীরসহ ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে *(বুখারী 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়-১৩, ২৫ অনুচ্ছেদ)*। তবে একাকী ছালাতে খুৎবা দিবে না। আর জামা'আতের সাথে আদায় করলে এবং খুৎবা দেওয়ার উপযুক্ত কেউ থাকলে তিনি খুৎবা দিবেন। কারণ ঈদের ছালাতে খুৎবা দেওয়া ও শোনা সুন্নাত, যদিও জুম'আতে খুৎবা দেওয়া ও শোনা ওয়াজিব। তবে যদি কেউ আদায় করতে না পারে তবে ক্বাযা করতে হবে না। কেননা এটি ফরযে কেফায়াহ *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/২৮৯; মুগনিউল মুহতাজ ১/৫৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ২০৫ পৃ.)*।

***প্রশ্ন (৩/৩৬৩) :* রাসূল (ছাঃ) কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে একত্রে খেয়েছেন মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? সেটা ছহীহ হ'লে অন্যান্য হাদীছের সাথে এর সমন্বয় কি হবে?**

-আশরাফুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। আর তা হ'ল- জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাওয়াতে বসান। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নামে এবং (সব ব্যাপারে) তাঁর উপর আস্থা ও ভরসা সহকারে খাও *(তিরমিযী হা/১৮১৭; আবূদাঊদ হা/৩৯২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪২; মিশকাত হা/৪৫৮৫)*। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী, আলবানী, আরনাঊত্বসহ সকল মুহাক্কিক যঈফ বলেছেন *(যঈফাহ হা/১১৪৪; যঈফুল জামে' হা/৪১৯৫)*। তাছাড়া এটি সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ রাসূল বলেন, 'তোমরা কুষ্ঠরোগী হ'তে এমনভাবে পলায়ন কর, যেভাবে তোমরা সিংহ থেকে পলায়ন কর' *(বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭)*। রাসূল (ছাঃ) একবার ছাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বরং তিনি লোক পাঠিয়ে বলে দেন, আমরা তোমার বায়'আত নিয়েছি। তুমি ফিরে যাও' *(মুসলিম হা/২২৩১; মিশকাত হা/৪৫৮১)*। অতএব উক্ত যঈফ হাদীছের আলোকে ছোঁয়াচে রোগ অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বরং ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব রয়েছে; তবে সেটি কেবল আল্লাহর হুকুমেই সংক্রমিত হয়। এটাই হ'ল সঠিক আক্বীদা। সুতরাং যথাযথভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং করোনা আক্রান্তদের পাশে সাধ্যমত দাঁড়াতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার রবের প্রতি বিনয়ী হয়ে ও দৃঢ় ঈমান রেখে বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াও *(ছহীহাহ হা/২৮৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : ফরয গোসলের সঠিক নিয়ম না মেনে কেবল তিনবার পুরো শরীর ধৌত করলে কি গোসলের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে?

-আনীসুর রহমান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে পুরো দেহ পানি দ্বারা ধৌত করলেও গোসলের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২২৫; আশ-শারহুল মুমতে' ১/৩৬২)*। আল্লাহ বলেন, আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে যাও, তাহ'লে গোসল কর *(মায়েদাহ ৫/৬)*। তবে সেক্ষেত্রে নিয়ত করা ফরয। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সকল সৎকর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল *(বুখারী হা/১)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : মৃতব্যক্তির কবরে কয়েকজন মিলে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-রওশন আলী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন দলীল নেই। অতএব এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৪/১৩৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২০৪, ১৩/৩৪০;*

উছায়মীন, ফাতাওয়াল জানায়েয ২৬৬ পৃ.)। সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার জন্য জানাযা ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান নেই। যেহেতু মৃতব্যক্তির কবরে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেহেতু মৃতব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য সকলে পৃথক পৃথক ভাবে দো'আ করতে হবে।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : সালাম ফিরানোর পর ইমাম বা মুক্তাদী কোন দো'আ না পড়েই কি উঠে যেতে পারবে?

-রওশন আলী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য মুছাল্লায় বসে দো'আ ও যিকির করা সুন্নাত। কারণ এ সময়ে ফেরেশতাগণ দো'আ পাঠরত মুছল্লীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাত শেষে যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করে, ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য দো'আ করতে থাকে এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর *(বুখারী হা/৪৪৫, মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২)*। তবে কেউ যদি ওযরের কারণে যিকির-আযকার সংক্ষিপ্ত করতে চায় তবে কমপক্ষে তিনি *'আল্ল-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম'* বলে উঠে যাবেন *(বুখারী হা/৮৪৯; মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : আমার এক বোন নাবালেগ অবস্থা থেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু। কিন্তু আমি ও আমার পিতা জন্মগতভাবে মুসলিম। কিছুদিন পূর্বে পিতা মারা গেছেন। এক্ষণে আমার বোন কি পিতার সম্পদের অংশ পাবে? তার সাথে আমার কেমন ব্যবহার করা উচিৎ?

-আব্দুল মান্নান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত বোন পিতার সম্পদে ওয়ারিছ হবে না। কারণ সে এখন অমুসলিম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম কোন কাফেরের ওয়ারেছ হবে না এবং কাফের কোন মুসলিমের ওয়ারেছ হবে না' *(বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। তবে যেহেতু উক্ত বোন নাবালক অবস্থায় হিন্দু হয়েছে সেহেতু তাকে বুঝিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। বিভিন্ন উপায়ে বা সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে *(তওবাহ ৯/৬০)*। তাছাড়া বোন হিসাবে তার সাথে সর্বদা সদাচরণ করবে *(মুমতাহিনা ৮)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : পুরুষের জন্য নারীদের মত নকশাদার চাদর পরিধান করা জায়েয হবে কি?

-হাফীযুল ইসলাম, পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তর : পুরুষেরা নারীদের মত এবং নারীরা পুরুষদের মত পোষাক পরবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে মহিলার এবং মহিলার সাথে পুরুষের সাদৃশ্য পোষণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। তবে সাধারণভাবে নকশাদার পোষাক পরা যাবে। পুরুষদের জন্য নকশাদার চাদর পরিধান দোষের নয়। কারণ নকশা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত, যা গ্রহণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তবে তাতে যেন বাহুল্য না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া ছালাতের সময় অধিক নকশাদার, ছবিযুক্ত বা লেখাযুক্ত পোষাক পরা যাবে না, যা মুছল্লীর মনোযোগ বিঘ্নিত করে *(বুখারী হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৭৫৭)*। উল্লেখ্য যে, নকশা যদি রেশমের সুতার হয়, তবে তা সামান্য অংশ বা চার আঙ্গুলের বেশী জায়গায় হওয়া যাবে না *(মুসলিম হা/২০৬৯; মিশকাত হা/৪৩২৪, নববী, শরহ মুসলিম উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : সকল মানুষকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ঐক্যবদ্ধ করা অথবা নিজেকে সংশোধন করা কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

-রফীকুল ইসলাম, মাতুয়াইল, ঢাকা।

উত্তর : নিজেকে সংশোধন করা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া এবং দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা কোনটির গুরুত্বই কম নয়। তবে প্রত্যেক আদম সন্তানের প্রাথমিক ও মৌলিক দায়িত্ব হ'ল নিজের আমল সংশোধন করাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয় *(আ'লা ৮৭/১৪)*। যারা নিজেদের সংশোধন না করে মানুষকে দাওয়াত দেয় তাদের পরিণতি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না? আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না? *(ছফ ৬১/২-৩)*। সুতরাং প্রথমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে এবং অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য হকপন্থী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগন! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। তিনি তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'তুমি বল, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : বর্তমানে মোবাইল সাধারণত মন্দ কাজেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষণে মোবাইল পণ্য ব্যবসা ও মোবাইল সার্ভিসিং পেশা হিসাবে হালাল হবে কি?

-মেহরাব হোসাইন, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত পেশা হালাল। কারণ এই পণ্যগুলো মৌলিকভাবে হালাল। এগুলোর ভালো-মন্দ নির্ভর করে ব্যবহারকারীর তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপর। এক্ষণে ব্যবহারকারীগণ যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করেন তবে পাপ তাদের উপরেই বর্তাবে, বিক্রেতার উপর নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আমাদের মসজিদের ইমাম আহলেহাদীছ হওয়ায় মুনাজাত করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি চাকুরীচ্যুত হন। কিন্তু মসজিদের জমিটি ইমামের বড় ভাই ও অন্য একজনের ব্যক্তি মালিকানাধীন। এক্ষণে মসজিদ কমিটি জমিটি মসজিদের নামে লিখে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু পরিবারের আশংকা জমি লিখে দিলে তাদেরকে সেখানে আর ছালাতই আদায় করতে দেয়া হবে না। এক্ষণে তাদের করণীয় কি?

-কায়ছার রহমান নাসীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মসজিদের জন্য দানকৃত জমি মসজিদকে দিয়ে দিতে হবে। কারণ দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয়া যায় না *(বুখারী হা/২৬২১; মিশকাত হা/৩০১৮)*। তবে লিখিত দলীল করার সময় শিরক ও বিদ'আত পরিত্যাগের কঠোর শর্ত উল্লেখ পূর্বক দান করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ'আত দূরীকরণেও সহায়ক হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/৩৬০)*। উল্লেখ্য যে, ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধ মুনাজাত এবং ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সরবে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৫১৯)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : জনৈক আলেম লিখেছেন কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে এবং তা কোন হাসান হাদীছের বিপরীত হ'লে হাসান হাদীছ আমলযোগ্য হবে না। একথা সঠিক কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছহীহ ও হাসান সনদে বর্ণিত হাদীছদ্বয় পরস্পর বিরোধী হ'লে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয় তাহ'লে ছহীহ সনদে বর্ণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিতে হবে *(নববী, আত-তাকরীব ওয়াত-তায়সীর ২৯ পৃ., হাফেয ইবনু হাজার, নুযহাতুন নযর ৭৮, ২১০ পৃ.)*। তবে সাধারণতঃ রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত কোন হাদীছ এমন পরস্পর বিরোধী হয় না, যা সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : অমুসলিমদের কাছ থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করা যাবে কি? এটা কবুলযোগ্য হবে কি?

-কায়ছার রহমান, শিকটা, জয়পুরহাট।

উত্তর : হালাল প্রাণী অমুসলিমদের থেকে ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। আর কুরবানী হিসাবে কবুল হ'তেও কোন সমস্যা নেই। কারণ আল্লাহ যে সকল প্রাণী হালাল করেছেন তা খাওয়া হালাল সেটি যেখানেই লালিত-পালিত হোক না কেন *(মায়েদাহ ৫/৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : শেষ বৈঠকে পড়ার জন্য দরূদে ইব্রাহীমী ব্যতীত অন্য কোন দরূদ আছে কি?

-সাখাওয়াত হোসাইন, সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছে বিভিন্ন শব্দে ছহীহ সনদে ৭টি দরূদ বর্ণিত হয়েছে *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী, ১৬৫-১৬৮ পৃ.)*। তাশাহ্হুদে এর যেকোন একটি পাঠ করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এর মধ্যে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করাই সর্বোত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৪৫৪-৪৫৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২০২-২০৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৯৯-৪০০)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : রোগ-বালাই থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরিধান কি তাবীযের উপর নির্ভরশীলতার সাথে তুলনীয় নয়? এটা শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে কি?

-হাসান, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : তাবীযের সাথে মাস্কের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ তাবীয ঝুলিয়ে তার উপরই ভরসা করা হয়। আর মাস্ক পরে ভাইরাসকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। কারণ ভাইরাস সাধারণত মুখ ও নাক দিয়ে প্রবেশ করে। এদের ঠেকাতেই মাস্ক ব্যবহার করা। আর শরী'আতে সতর্কতা ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে *(মুসলিম হা/২২৩১; মিশকাত হা/৪৫৮১)*। অতএব এতে শিরকের কোন বিষয় নেই।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : জমি বন্ধক নেওয়া বা দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-মামুন হাসান, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : লাভ ভোগ করার প্রচলিত নিয়মে বন্ধক রাখা যাবে না। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদ *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৫০; আল-মুদাওয়ান্নাহ ৪/১৪৯; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। ছাহাবীগণ এমন ঋণ নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। তবে অর্থের বিনিময়ে জমি ভাড়া (লীজ) দেয়া বা নেয়া জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : আমি মোটা অংকের অর্থ অন্য একজনকে হাদিয়া হিসাবে দিয়েছি এবং চেক দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তিনি এখনো আমার একাউন্ট থেকে তা উত্তোলন করেননি। এক্ষণে উক্ত অর্থের যাকাত আমাকে দিতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : যেহেতু চেক প্রদান করা হয়ে গেছে সেহেতু দাতাকে যাকাত দিতে হবে না। বরং যে হাদিয়াপ্রাপ্ত হয়েছে যদি তার সম্পদ নেছাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহ'লে সে-ই যাকাত প্রদান করবে *(তিরমিযী হা/৬৩১; মিশকাত হা/১৭৮৭; ইরওয়া হা/৭৮৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। এক্ষেত্রে গ্রহীতার কর্তব্য হ'ল, দ্রুত অর্থ উত্তোলন করে নিজের যিম্মায় নেয়া এবং হিসাব করে যাকাত আদায় করা।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : করোনাকালে ইহরাম অবস্থায় মাস্ক পরিধান করা যাবে কি?

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল আবৃত করা সিদ্ধ নয় *(বুখারী হা/১৫৪২; মুসলিম হা/১১৭৭; মিশকাত হা/২৬৭৮; ইরওয়া হা/১০২২)*। তবে সাময়িকভাবে বিশেষ শারঈ ওযর বশত বা ভাইরাসের

বিস্তৃতি রোধে ইহরাম অবস্থাতেও মাস্ক পরিধান করা যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৩০-৩১)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : ফরয গোসলের পূর্বে কৃত ওযূতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : গোসলের পূর্বে ওযূ করলে এবং এর মধ্যে ওযূ নষ্ট না হ'লে উক্ত ওযূতে ছালাত আদায় জায়েয হবে। আর এটাই ফরয গোসলের সঠিক পদ্ধতি *(বুখারী হা/২৪৮, মিশকাত হা/৪৩৫, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : আমার বিবাহের জন্য যে পাত্রী ঠিক করা হয়েছে তার পিতা পূর্বে সূদী কারবারের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে নেই। এমন পরিবারে বিবাহ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : মেয়ে সৎ, ধার্মিক ও তাক্বওয়াশীল হ'লে বিবাহে কোন বাধা নেই। কেননা একের পাপ অন্যে বহন করে না। তাছাড়া বর্তমানে উক্ত ব্যক্তি সূদের সাথে জড়িতও নয় *(আন'আম ৬/১৬৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/৪৫)*। সুতরাং ঐ পরিবারে বিবাহ করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : চার কালেমা মুখস্থ না থাকলে কেউ মুসলিম থাকে না। কথাটির সত্যতা জানতে চাই। উক্ত চার কালেমা কি কি?

-আবূ সাঈদ, ঢাকা।

উত্তর : মুসলিম হওয়ার জন্য চার কালেমা মুখস্থ করা শর্ত নয়; বরং চার কালেমার বিষয়বস্তুর উপর ঈমান আনা ও তার উপর আমল করা শর্ত। উল্লেখ্য যে, চার কালেমা হ'ল, আল্লাহ্র তাওহীদের সাক্ষ্য যুক্ত কিছু বাক্য, যেগুলোকে পরবর্তী বিদ্বানগণ কুরআন ও হাদীছ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। যেমন- (১) কালেমা ত্বাইয়েবা তথা لا إله إلا الله, যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালেমা *(ইবরাহীম ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৭৯)*। (২) কালেমা শাহাদাত, যা দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উভয়ের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়- أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪)*। এছাড়াও রয়েছে কালেমা তাওহীদ, কালেমা তামজীদ প্রভৃতি, যেগুলি ইজতিহাদ ভিত্তিক *(আরবী ক্বায়েদা ১ম ভাগ, ২৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : আমার এক মামাকে ৫০,০০০/- টাকা ধার দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে তিনি এমন ঋণগ্রস্থ যে আমার সেই টাকাগুলো আর ফেরত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন হ'ল- এ বছর আমার যাকাতের কিছু অর্থ যেমন ১০,০০০/- টাকা তাকে না জানিয়ে কেটে রেখে বাকী টাকাগুলো পরের বছরগুলোতে যাকাতের অর্থ থেকে একই ভাবে কেটে রেখে তার ঋণ আদায় করে নিতে পারব কি?

-ইঞ্জিনিয়ার মিনহাজুদ্দীন, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এভাবে ঋণগ্রহীতাকে না জানিয়ে তার নামে যাকাত বাবদ অর্থ কর্তন করা যাবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২১০; আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/৩০০)*। বরং এক্ষেত্রে দু'টি করণীয় হ'তে পারে। ১. ঋণগ্রহীতা যাকাতের হকদার হ'লে তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে অর্থ প্রদান করবে, যা দ্বারা তিনি ঋণ পরিশোধ করবেন। ২. ঋণ পরিশোধে অক্ষম হ'লে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে বা আরও অবকাশ দিতে পারে। কারণ আল্লাহ বলেন, তবে যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি তোমরা ওটা দান করে দাও (অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দাও), তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ *(বাক্বারাহ ২/২৮০)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : ছালাতে কোন রাক'আতে সিজদার সংখ্যা ১টি না ২টি হ'ল এমন সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?

-মুখতারুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় কোন রাক'আতে যদি একটি সিজদা হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে সালামের পূর্বে আরেকটি সিজদা দিবে এবং সহো সিজদা দিবে। আর ছালাতের পর এমন সন্দেহ হ'লে মসজিদে থাকা অবস্থায় সিজদাটি ক্বাযা আদায় করে নিবে। আর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হ'লে তা আর ক্বাযা করতে হবে না *(বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭১; বাহূতী, শারহু মুনতাহাল ইবাদাত ১/২৩৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৮৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : একদল মানুষ জুম'আর জন্য মসজিদে এসে জামা'আতে শরীক হ'তে পারেনি। এক্ষণে তারা দুই রাক'আত না চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে?

-রওশন আলী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : একাকী হোক বা একাধিক ব্যক্তি হোক জুম'আর ছালাত ছুটে গেলে তারা যোহরের চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(তিরমিযী হা/৫২৪; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেয়ে যাবে, সে জুম'আ পেয়ে গেল। সে যেন আরেক রাক'আত মিলিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি এক রাক'আত পেল না সে যেন চার রাক'আত যোহর পড়ে নেয় *(দারাকুৎনী হা/১৬২২; নাসাঈ হা/৫৫৭; ইরওয়া হা/৬২২)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি তুমি জুম'আর এক রাক'আত পাও, তবে তার সাথে আরেক রাক'আত যোগ কর। আর যদি রুকূ না পাও, তাহ'লে চার রাক'আত (যোহরের ছালাত) আদায় কর *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ৩/২০৪; ত্বাবারাণী কাবীর, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/৮২, তামামুল মিন্নাহ ৩৪০ পৃ.)*। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে জমহূর বিদ্বান ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(তিরমিযী হা/৫২৪-এর আলোচনা; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৫৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ কি কেবল ইমামই বলবে না মুক্তাদীও বলবে?

-রবীউল আহসান, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* ও *'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ...'* বলবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারে *(বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত ৩/১৮৯ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*। অবশ্য শায়খ উছায়মীন ও বিন বাযসহ কতিপয় বিদ্বানের অভিমত হ'ল ইমাম 'সামি'আল্লাহ' এবং 'রব্বানা....' উভয়টি বলবে। আর মুক্তাদী কেবল 'রব্বানা লাকাল হামদ' বললেই যথেষ্ট হবে *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতুহ ৩২০/১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৭/৯৩-৯৪)*। তবে উভয়ের জন্য দু'টি বাক্য বলার বিষয়টিই ছহীহ হাদীছের অধিক নিকটবর্তী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১৩৫ পৃ.; ছালাতুর রাসূল ১০৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : আমার ১০ লক্ষ টাকা ঋণ আছে। কিন্তু এখন তা শোধ করতে চাই না। এক্ষণে যাকাত বের করার সময় মূলধন থেকে উক্ত ঋণের টাকা হিসাবের বাইরে রাখতে হবে কি?

-আব্দুল লতীফ, কুমিল্লা।

উত্তর : ঋণের টাকা হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। কারণ সে তা দ্বারা লাভবান হচ্ছে। অতএব মোট সম্পদ হিসাব করেই যাকাত দিতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৫১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১৮৯)*। এক্ষণে যাদের ঋণ আছে তাদের কর্তব্য হ'ল প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে, এরপর হিসাব করে যাকাত দিবে। ওছমান (রাঃ) জুম'আর খুৎবায় বলেন, 'এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহ'লে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩; আলবানী, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : ফাতেমা (রাঃ)-কে কি হত্যা করা হয়েছিল? নাকি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

-সাখাওয়াত হোসাইন, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর : ফাতেমা (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়নি; বরং তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা যান *(বুখারী হা/৩০৯৩; মুসলিম হা/১৭৫৯)*। ১১ হিজরীর ৩রা রামাযান মঙ্গলবার রাতে ৩০ অথবা ৩৫ বছর বয়সে ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(আল-বিদায়াহ ৫/২৬৭-৭০, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৯৫-১১১, দ্রঃ সীরাতুর রাসূল ৭৯ পৃ.)*। ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেন, ফাতেমা (রাঃ) ১১ হিজরীর তৃতীয় রামাযান সোমবারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ২৫-২৯ বছর হয়েছিল। বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল *(আব্দুর সাত্তার শায়খ, ফাতিমাতুয যাহরা (দারুল কলম), ৩৫২, ৩৫৭-৩৫৮ পৃ.)*। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২০-২১ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, শী'আদের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশনায় কুনফুয ফাতেমা (রাঃ)-কে আঘাত করেছিল। ফলে তাঁর গর্ভপাত ঘটে এবং পরবর্তীতে সেই আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন *(বিহারুল আনওয়ার ৪৩/১৭০)*। এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। স্বীকৃত কোন ইতিহাস গ্রন্থে এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : আমাদের এলাকা সহ আশপাশের কোথাও কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। এমতাবস্থায় নিজ অবস্থানস্থল থেকে মহামারী কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে জামা'আত পরিত্যাগ করে বাড়িতে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে?

-আরফান রেযা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : দূরত্ব নির্ধারণ নয়, বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যদি দেখা যায় যে, এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী মসজিদে আগত মুছল্লীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভাইরাসে আক্রান্ত থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে। আর তদ্রূপ না হ'লে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার আদায়কৃত ছালাত আল্লাহ কবুল করবেন না *(আবূদাঊদ হা/৫৫১; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*। ভয়-ভীতি বা অসুস্থতা ও মহামারী ছড়িয়ে পড়া একটি বড় ওযর। সেজন্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে বাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে, দূরত্ব কোন বিষয় নয় *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৪/১৬, ১/৪৯৮; আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, শরহ আবূদাঊদ ৬/২৭৫)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : বিসমিল্লাহ না লিখে 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি' বা ৭৮৬ ইত্যাদি লেখা জায়েয হবে কি?

-ওয়াকার ইউনুস, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : বিসমিল্লাহ বলেই শুরু করতে হবে। আর 'বিসমিল্লাহ'র পরিবর্তে ৭৮৬ সংখ্যা লেখা যাবে না। কেননা আরবী হরফসমূহের আবজাদী তথা সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা পদ্ধতিতে 'বিসমিল্লাহ্'-এর ১৯টি হরফের মান যোগ করে ৭৮৬ বানানো হয়েছে, যা নিছক কপোলকল্পিত। আর তা কখনোই 'বিসমিল্লাহ্'-এর বিকল্প নয়। মূলতঃ 'বিসমিল্লাহ' কুরআনের আয়াতাংশ *(নমল ২৭/৩০)* এবং আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদতের শব্দ। আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে সকল শুভ কাজে 'বিসমিল্লাহ' ব্যবহার করা অন্যতম ইবাদত। সুতরাং 'বিসমিল্লাহ্'-র পরিবর্তে ৭৮৬ ব্যবহার করলে তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না এবং তাতে কোন নেকী হবে না। একইভাবে অনুবাদ লিখলেও হবে না। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন রীতি নেই। সর্বোপরি এটি কুরআনের আয়াত মনে করে পড়লে প্রতি হরফে ১০ নেকী লাভ হবে। কিন্তু অনুবাদ পড়লে তা হবে না।

যদি বলা হয়, এর দ্বারা 'বিসমিল্লাহ'-কে যত্রতত্র অমর্যাদাকর ব্যবহার থেকে রক্ষা করা যায়, সেটি ভুল হবে। বরং 'বিসমিল্লাহ' বলেই এর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। অস্পষ্ট সংকেতে লেখায় বরং এর প্রতি অসম্মান করা হবে। আর কোথাও অমর্যাদার আশংকা থাকলে মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট। লেখার প্রয়োজন নেই। যেমনভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) ছহীহ বুখারীর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখেননি।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : কোন পুরুষ সন্তান জন্মদানে অক্ষম হ'লে তার কাছ থেকে 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে কি?

-সানোয়ারা বেগম, রামজীবনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যদি মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পুরুষের সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা নেই, তাহ'লে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে বা খোলা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কারণ বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হ'ল সন্তান লাভ করা। আর সন্তান জন্মের সক্ষমতা না থাকা স্বামীর একটি দোষ। যে কারণে স্ত্রী খোলা করে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/১৬৬; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২২০)*। স্মর্তব্য যে, শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*। অতএব এমতাবস্থায় নারী চাইলে ধৈর্য সহকারে স্বামীর সংসারে থাকতে পারে অথবা খোলা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : আমাদের সমিতি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ফ্যান ক্রয়ের জন্য কোম্পানীতে অগ্রিম টাকা জমা দেয়া হয়। অতঃপর করোনা পরিস্থিতির কারণে তারা সময়মত তা ডেলিভারী না দিয়ে অন্যত্র বিক্রয় করে দেয়। এখন তারা মাল না থাকায় পূর্বে গৃহীত প্রত্যেক ফ্যানের সাথে অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে লাভ দিয়ে অগ্রিম প্রদত্ত টাকা ফেরত দিতে চাচ্ছে। উক্ত লভ্যাংশ সহ টাকা নেওয়া যাবে কি? এটা টাকার বিনিময়ে অধিক টাকা নেওয়ার নামান্তর হবে কি?

-মোর্শেদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এতে টাকার বিনিময়ে অধিক টাকা নেওয়া হচ্ছে। বরং এর পরিবর্তে যদি কোম্পানীটি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে, যা 'মুযারাবাহ' হিসাবে গণ্য হবে বলে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৭২, ৫/২৯২ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : ঋণ গ্রহণ করে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল হাই আব্দুল হাদী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ঋণ করে কুরবানী করা জায়েয। যদি উক্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৬/৩০৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৩৭)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : জনৈক ইসলামবিদ্বেষী লেখক লিখেছেন, রাসূল (ছাঃ) মানুষের কথায় সন্দেহ করে তার সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী ও খলীফা আবুবকরের মত মানুষের সন্তান আয়েশার প্রতি যে আচরণ করেছেন তা কি নবীসুলভ বা অনুকরণীয়? অহী যদি না আসতো তবে কি আয়েশা বঞ্চনার শিকার হ'তেন না? বর্তমানে তো অহী আসবে না। তাহ'লে একজন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যদি উক্ত ঘটনার অবতারণা হয়, তবে সে কি করবে? তার জন্য নবী (ছাঃ) কী আদর্শ রেখে গেছেন? একজন মানুষ হিসাবে কী রাস্তা দেখিয়ে গেলেন? নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে কি তার স্ত্রীকে তালাক দেবে না? এভাবেই কি তালাকের অভিশাপ সমাজকে কলুষিত করছে না? উক্ত প্রশ্নের জবাব কি?

-জাবের হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জঘন্য ও অজ্ঞতাপ্রসূত। যারা এমন বিশ্বাস রাখবে তারা কাফের হয়ে যাবে *(ইবনুল 'আরাবী, 'আরেযাতুল আহওয়াযী ১১/৫২)*। রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি সন্দেহের বশে নয়, বরং মুনাফিকদের অপপ্রচার দেখে এবং কিছু ছাহাবীর পরামর্শে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন অহী প্রাপ্তির মাধ্যমেই তাঁর পবিত্রতার বিষয়টি নিশ্চিত হোক *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৮/৪৮০)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হ'লে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। কেননা বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তওবা কবুল করেন *(বুখারী হা/২৬৬১; মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। আর রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দেহ করেননি বলেই আলী ও বারীরা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ শেষে খুৎবায় দাঁড়িয়ে বলেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না *(বুখারী হা/২৬৬১; মুসলিম হা/১৬৯৫)*। দুঃখজনক হ'ল, নবী বিদ্বেষীরা এমন রাসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় যে রাসূল কখনো স্ত্রীদের প্রহার কিংবা গালি-গালাজ পর্যন্ত করেননি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক জিহাদের ময়দান ব্যতীত নিজ হাত দিয়ে কাউকে মারেননি, এমনকি তাঁর স্ত্রী ও খাদেমদেরকেও না *(মুসলিম হা/২৩২৮; মিশকাত হা/৫৮১৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : পিতা-মাতার নিকট মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়ে দান করা জায়েয কি?

-ওয়াহীদুযযামান, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : মিথ্যা বলে পিতা-মাতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে দান করা জায়েয নয়। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক বলেই গণ্য হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। তবে পিতা-মাতাকে না বলে বৈধ উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ হ'তে সামান্য কিছু দান করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা যদি (স্বামীর অনুমতি ছাড়াই) তার বাড়ীর কিছু সম্পদ দান করে এবং এতে সম্পদ ধ্বংস করা উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে দান করার কারণে মহিলার নেকী হবে আর উপার্জন করার কারণে

স্বামীরও নেকী হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ছেলে পিতাকে না বলে হক পথে কিছু দান করলে উভয়ের নেকী হবে। যদি পিতা তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : ভ্যানিলা এসেন্সযুক্ত খাবার খাওয়া হালাল হবে কি?

-সামী ইউসুফ, নাটোর।

উত্তর : ভ্যানিলা এসেন্সযুক্ত খাবার খাওয়া হালাল। তবে বাজারে প্রাপ্ত ভ্যানিলায় যদি অধিক পরিমাণে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে তা হারাম' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/৩৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪, ২২/১৪৪)*। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যদি এমন সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, যা মাদকতা আনে না; তাহ'লে তা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৫৪; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/৩৭০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে?

-হাসীবুল ইসলাম, বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : সালাম ফিরানোর সময় মুছল্লী স্বাভাবিক ভাবে ডানে বা বামে দৃষ্টিপাত করে সালাম ফিরাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত আদায়কারী তার ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদান করবে *(মুসলিম হা/৪৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪০১৯)*। অতএব সালাম ফিরানোর সময় ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদানের নিয়ত করবে। আর যদি একাকী ছালাত আদায় করে, তাহ'লে ডানে ও বামে থাকা ফেরেশতাদের সালাম প্রদানের নিয়ত করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৫৬, ৪৬২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩২৬, ৩২৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২০৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমাকে জাহাযে কখনো ১ বছর বা তারও বেশী একটানা জাহাযে অবস্থান করতে হয়। জাহাযও বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে চলমান থাকে। এমতাবস্থায় ছালাত জমা ও ক্বছর করা এবং সুন্নাত ছালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-মুশফীকুল মুনীর, গাইবান্ধা।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছালাত কছর করা যাবে। তবে ছালাত জমা' তাকদীম বা তাখীর তখনই করা উত্তম হবে যখন যথা সময়ে ছালাত আদায়ের সুযোগ পাবে না। কারণ আল্লাহ ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩৭০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৮১-২৮২)*। সামুদ্রিক সফরে এক বছর অবস্থান করলেও ছালাত কছর করতে পারবে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, যতদিন পর্যন্ত ইকামত বা নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত না নিবে, ততদিন একজন মুসাফির কছর আদায় করবে। যদিও এভাবে বহু বছর কেটে যায় *(তিরমিযী হা/৫৪৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও ছয় মাস যাবৎ কছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২ পৃঃ; ইরওয়া হা/৫৭৭, সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও কছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮৬ পৃ.; মিরক্বাত ৩/২১১ পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহায, বিমান, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে কছর করতে পারেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৭ পৃঃ)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, ক্বছর করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং অধিকাংশ ছাহাবী সর্বদা ক্বছরকেই অগ্রাধিকার দিতেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১২)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : ইমাম মাহদী আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হ'লে মুমিনদের জন্য করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ ছিয়াম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম মাহদীর আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সহজসাধ্য নয়। তবে বিভিন্ন আলামত দেখে প্রকৃত মুমিনরা অনুধাবন করতে পারবেন। যেমন তাঁর আগমনের অন্যতম আলামত হ'ল, তিনি এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আগমন করবেন যখন সমগ্র দুনিয়া অন্যায় ও অত্যাচারে ভরে যাবে। অতঃপর তিনি এক রাতেই ন্যায় ও ইনছাফে ভরে দিবেন *(আবুদাউদ হা/৪২৮৫; ছহীহাহ হা/১৫২৯)*। তিনি একাধারে সাত বছর শাসনকার্য চালাবেন, সম্পদের সঠিক বণ্টন করবেন। ঘন ঘন বৃষ্টি বর্ষণ হবে। ফলে বৃক্ষ-তরুলতায় পৃথিবী ভরে যাবে এবং গবাদিপশুর প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবে। মুসলিম উম্মাহ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে *(ছহীহাহ হা/৭১১)*। তিনি যখনই আগমন করবেন তখন মুমিনদের আবশ্যিক কর্তব্য হবে আমীর বা নেতা হিসাবে তাঁর যথাযথভাবে অনুসরণ করা। এমনকি স্বয়ং ঈসা (আঃ)-ও তাঁর ইমামতিতেই ছালাত আদায় করবেন *(মুসলিম হা/১৫৬; ছহীহাহ হা/২২৩৬; মিশকাত হা/৫৫০৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : অমুসলিমদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা যাবে কি? তার মৃত্যুতে ইন্নালিল্লাহ বলা বা তার জন্য প্রার্থনা করা কিংবা 'ওপারে ভাল থাকবেন' জাতীয় বাক্য বলা জায়েয কি?

-মুহায়মিনুল হক, প্রফেসরপাড়া, মাগুরা।

উত্তর : কোন অমুসলিমের মৃত্যুতে প্রয়োজনে তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিকট শোক প্রকাশ করা যাবে বা তাদেরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া যাবে। তাদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে 'ইন্নালিল্লাহ..' বলাতেও কোন বাধা নেই। কেননা এগুলি স্বাভাবিক মানবীয় সদাচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত *(মুমতাহিনা ৬০/৮, ইবনু কুদামা ২/৪১০; মুগনিউল মুহতাজ ২/৪২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। তবে তাদের জন্য কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা বা রহমতের দো'আ করা সিদ্ধ নয় *(তওবা ৯/৮৪; নববী, আল-মাজমু' ৫/১১৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া ১২/৪৮৯)*। কেননা যে ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেনি, সে নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী *(বাইয়েনাহ ৯৮/৬; মুসলিম হা/১৫৩)*। আল্লাহ বলেন, 'মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা নিজেদের আত্মীয় হয়, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী' *(তওবা ৯/১১৩)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত মায়ের জন্যও ইস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা

করতে নিষেধ করা হয়েছিল *(মুসলিম হা/৯৭৬)*। অতএব কোন অমুসলিমের মৃত্যুতে 'ওপারে ভাল থাকবেন' বা 'শান্তিতে বিশ্রাম নিন' (RIP) ইত্যাদি প্রার্থনাসূচক বাক্য বলা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কি তাঁর পরিবারের জন্য মহামারীর আক্রমণ প্রার্থনা করেছিলেন?

-খাদেমুল ইসলাম, রিয়ায, সঊদী আরব।

উত্তর : ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর পরিবারের জন্য মহামারীকে রহমত হিসাবে কামনা করেছিলেন। আর এতে তাঁর দুই স্ত্রী ও পুত্রসহ তিনি নিজে মারা যান। হাদীছে এসেছে, সেনাপতি আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর সেনাপতি হন রাসূল (ছাঃ)-এর আরেক প্রিয় ছাহাবী মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)। সবাই তখন প্লেগের আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নতুন সেনাপতি হবার পর মু'আয (রাঃ) একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, এই প্লেগ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন মুছীবত নয় বরং إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ 'এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে রহমত এবং নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দো'আর ফল। এতে ইতিপূর্বে বহু সৎকর্মশীলের জীবন নাশ হয়েছে। হে আল্লাহ! এটি মু'আযের পরিবারেও পাঠান। যাতে আমরাও এ রহমতের একটি অংশ পাই। দো'আ শেষে ঘরে ফিরে দেখলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পুত্র আব্দুর রহমান প্লেগাক্রান্ত হয়ে গেছেন। ছেলে তার পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুরআনের ভাষায় বলেন, 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাকারাহ ২/১৪৭)*। পুত্রের সান্ত্বনার জবাব পিতাও দেন কুরআনের ভাষায়- 'ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে' *(আছ-ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

কিছু দিনের মধ্যে তাঁর প্রিয় পুত্রটি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর দুই স্ত্রীও মারা যান। অবশেষে তাঁর হাতের একটি আঙ্গুলে ফোঁড়া বের হয়। এটা দেখে মু'আয (রাঃ) খুবই খুশী হন এবং বলেন, দুনিয়ার সকল সম্পদ এটির তুলনায় মূল্যহীন। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন *(আহমাদ হা/২২১৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৪০২)*। স্মর্তব্য যে, এই প্রার্থনা তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ছিল। তাছাড়া তিনি জীবন থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই প্রার্থনা করেননি। বরং মহামারীতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছিলেন। কারণ নিজের বিরুদ্ধে দো'আ করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না *(মুসলিম হা/৩০০৯; মিশকাত হা/২২২৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা নিজের জন্য যা কল্যাণকর, শুধু সেটাই চাও। কেননা তোমরা যা বল তার জন্য ফেরেশতাগণ আমীন, আমীন বলতে থাকেন *(মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

হাযার হাযার করোনা রোগীকে নীরবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ। ইতিমধ্যেই তাদের অনেকে মৃত্যু বরণ করেছেন। আরো মৃত্যু বরণ করেছেন কয়েকশ' পুলিশ সদস্য। তাদের ঋণ জাতি কখনোই ভুলবে না। করোনায় মৃত হিন্দু-মুসলিমের লাশ সৎকার করে আজ নারায়ণগঞ্জের মোকছেদ কমিশনারের মত অনেকে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছেন। বিদেশী গণমাধ্যমে তাদের কথা প্রচারিত হয়েছে। তিনি ও তার স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হ'লে লেখক নিজে জুম'আর খুৎবায় এবং দেশের হাযার হাযার ঈমানদার মানুষ তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রাণখোলা দো'আ করেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা উভয়ে এখন করোনা মুক্ত ও সুস্থ। একদিন তারাও মারা যাবে। কিন্তু রেখে যাবে তাদের চিরস্থায়ী স্মৃতি। তার বংশধররাও পিতার সুনামের সুফল ভোগ করবে যুগ যুগ ধরে, যদি তারা পিতার মত হয়। বস্তুতঃ এদের মাধ্যমেই নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে।

অথচ তথাকথিত বিশ্ব নেতারা যারা পূর্বের ন্যায় এখনো বিশ্ব বিপর্যয়ের মূল নায়ক। তারা জঙ্গলের হিংস্র পশুর ন্যায় একে অপরের উপর হামলে পড়ার ছক আঁকায় ব্যস্ত। বঙ্গোপসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে পেটের দায়ে ভাসছে হাযারো মানুষ। মিয়ানমার সহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১০ কোটির উপর মানুষ সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে একটু আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু কোন নেতা তাদের আশ্রয় দিচ্ছেনা। ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, অঞ্চলভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি ভেদাভেদের রাজনীতি করে তারা সর্বত্র মনুষ্যত্বকে হত্যা করছে। বনের পশুও এদের চাইতে ভাল। তাইতো দেখি উহানের জনৈক ব্যক্তির পোষা কুকুরটি পাঁচদিন হাসপাতালের সামনে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে থাকে মনিবের আগমনের অপেক্ষায়। অবশেষে লোকেরা বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু না, সুস্থ হয়ে সে আবার ছুটে আসে হাসপাতালের সামনে। কেননা সে জানেনা যে তার মনিব মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ মোদীর সেনারা সর্বদা কাশ্মীরের মুসলমানদের জান-মাল-ইয্যত লুট করছে। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ২৫ হাযার অ-কাশ্মীরীদের নাগরিকত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে সীমান্তে নিরীহ নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের হত্যা করছে প্রতিদিন। এখন বর্ষা মওসুমে বাঁধের পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে মারছে। বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণকারী মোদীর রাজধানী দিল্লীতে পঙ্গপালের হামলা শুরু হ'লেও মোদী এখনো তওবা করেনি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত-রাশিয়া-চীন কেউ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি। ইস্রাঈলের ইহূদী প্রশাসন গাযায় বিমান হামলা করে ফিলিস্তীনের নির্যাতিত ও অবরুদ্ধ মুসলিমদের হত্যা করে চলেছে। অথচ করোনা ভাইরাস সে দেশেও হানা দিয়েছে। আমেরিকায় করোনার হানা সবচেয়ে বেশী হ'লেও সেদেশের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি বন্ধ হয়নি। তারা যে কেবল নগদ স্বার্থ দেখেছে। স্থায়ী স্বার্থের খবর জানেনা। আর তাই মানুষ ও মনুষ্যত্ব কোনটাই এদের কাছে নিরাপদ নয়।

করোনার সাথে আবার আসছে ডেঙ্গু মহামারী ও বন্যা। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনার সাথে সাথে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। সেই সাথে দেশে দেশে ও মানুষে মানুষে পরস্পরে সর্বোচ্চ নৈতিকতা ও মানবতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। অতএব হে মানুষ! সর্বাগ্রে মনুষ্যত্বকে বাঁচাও। করোনার সাথে যুদ্ধের ফালতু হুমকি ছাড়। বরং মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঠেকাও। করোনাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাকে ভয় করো। তাঁর বিধান মেনে চলো। মানুষকে ভালবাস ও মানুষের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার

(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

www.at-tahreek.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

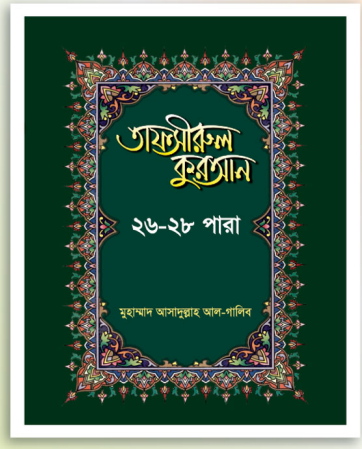

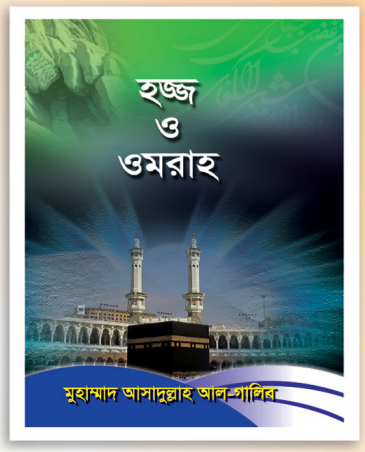

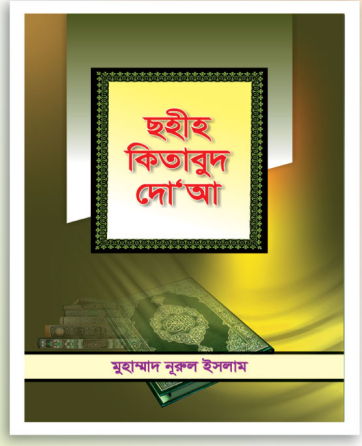

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।
www.at-tahreek.com